ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ

সাইয়েদ আবুল আ'লা
মওদূদী

ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১১৫

১ম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৮৫

১৩শ প্রকাশ

মহররম	১৪২৫
ফাল্গুন	১৪১০
মার্চ	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৮.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

اسلام کا سیاسی نظریات -এর বাংলা অনুবাদ

ISLAMER RAJNATIK MOTOBAD by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 8.00 Only.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামকে সাধারণত একটি গণতান্ত্রিক মতবাদ বলে অভিহিত করা হয়। অন্তত বিগত শতকের শেষার্ধ হতে অসংখ্যবার একথাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কিন্তু যারা একথাটি প্রচার করে বেড়ায়, তাদের মধ্যে হাযারে একজন লোকও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী নয় বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। এমনকি, ইসলামে কি ধরনের গণতন্ত্রের স্থান রয়েছে এবং এর স্বরূপই বা কি তা অনুধাবন করার জন্য তারা বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেনি। এদের কিছু সংখ্যক লোক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বাহ্যিক রূপ ও অনুষ্ঠানসমূহ লক্ষ্য করে এর উপর গণতন্ত্রের লেবেল এঁটে দিতে ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ লোকেরই মানসিকতা হচ্ছে মারাত্মক। দুনিয়াতে যে 'বস্তুটিকে সাধারণভাবে প্রচলিত হতে দেখে, ইসলামেও এর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য এই শ্রেণীর লোকেরা উঠে পড়ে লেগে যায়। আর এ ধরনের কাজকে তারা ইসলামের বিরাট খেদমত বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। সম্ভবত ইসলামকে তারা একটি অসহায় "ইয়াতীম শিশুর" সমপাংতেয় বলে মনে করে। কারণ ইয়াতীম শিশু যেমন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বাঁচতে পারে না। তারা মনে করে—ইসলামের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। কিংবা তারা হয়ত মনে করে—আমরা কেবল মুসলমান হওয়ার কারণেই দুনিয়ার বুকে সম্মানিত হতে পারিনি। আমাদের জীবন ব্যবস্থা ও আদর্শ দুনিয়ায় প্রচলিত সকল মত ও প্রথার মূলনীতিসমূহের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারলেই আমরা বিশ্বের দরবারে সম্মান লাভ করতে পারব।

এরূপ মনোবৃত্তির ফল মুসলিম সমাজে অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। দুনিয়ায় কমিউনিজমের উত্থানের সংগে সংগেই একদল মুসলমান দম্ভভরে ঘোষণা করতে লাগল ঃ কমিউনিজম ইসলামেরই এক নতুন সংস্করণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। অনুরূপভাবে যখন ডিকটেটরবাদের আওয়াজ উত্থিত হলো, তখন আবার কিছু সংখ্যক লোক 'নেতার আনুগত্য কর' 'নেতার আনুগত্য কর' বলে ধ্বনি তুলে বলতে লাগল যে, ইসলামের গোটা ব্যবস্থাই ডিকটেটরবাদের উপর স্থাপিত। মোটকথা ইসলামের রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বর্তমান সময় (নিছক অজ্ঞতার কারণে) একটি রহস্যজনক গোলক ধাঁধায় পরিণত হয়ে রয়েছে। এটাকে অসংখ্য ও বিভিন্ন প্রকার মতবাদের খিচুড়ি বলে মনে করা হয়েছে এবং দুনিয়ার বাজারে যে জিনিসটিরই চাহিদা বেশী ইসলামে

তারই অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে। বস্তুত বিষয়টি সম্পর্কে যথারীতি অনুশীলন ও গবেষণা করে দেখা একান্ত আবশ্যক। এর ফলে ইসলামী রাজনীতির কোন সঠিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা নির্ধারিত হলে এতদসম্পর্কিত যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি এবং বিক্ষিপ্ত চিন্তা কল্পনার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। উপরন্তু ইসলাম প্রকৃতপক্ষে কোন রাজনৈতিক ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা দান করতে পারে না বলে যারা নিজেদের চরম মূর্খতার পরিচয় দেয়—এ আলোচনায় কেবল তাদের মুখ বন্ধ হবে না, বস্তুত এতে জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে এক নির্মল ও স্বচ্ছ আলোকচ্ছটাও ফুটে উঠবে। বর্তমান দুনিয়া এদিক দিয়ে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। আজ এই নিবিড় অন্ধকারে বিভ্রান্ত মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য এরূপ আলো-বিকীরণের একান্ত আবশ্যকতা রয়েছে—যদিও দুনিয়াবাসীদের মনে সাধারণত এই প্রয়োজনের কোন অনুভূতি পরিলক্ষিত হয় না।

ইসলামী মতবাদের ভিত্তি

সর্বপ্রথম একটি কথা সকলের মনে বদ্ধমূল করে নেয়া আবশ্যক। তা এই যে, ইসলাম কয়েকটি বিক্ষিপ্ত মতবাদ চিন্তা এবং একাধিক কর্মনীতির সমষ্টি বা সমন্বয় নয়। এতে এদিক ওদিক হতে বিভিন্ন প্রকার মতের সমাবেশ করে দেয়া হয়নি। বস্তুত ইসলাম একটি সুসংবদ্ধ ও সুষ্ঠু আদর্শ। কয়েকটি সুদৃঢ় মূলনীতির উপর এর ভিত্তি স্থাপিত। এর বড় বড় স্তম্ভ হতে শুরু করে ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসেরই এর মূলনীতির সাথে এক যুক্তিসংগত সম্পর্ক রয়েছে। ইসলাম মানব জীবনের সমগ্র বিভাগ ও বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে যত নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতি পেশ করেছে, তার প্রত্যেকটিরই মূল প্রাণবস্তু ও আভ্যন্তরীণ ভাবধারা এর প্রাথমিক নীতি হতেই গৃহীত হয়েছে। এই নীতিসমূহ হতে পুরিপূর্ণরূপে একটি ইসলামী জীবন গঠিত হতে পারে—উদ্ভিদ জগতে যেমন বীজ হতে শিকড়, শিকড় হতে কান্ড, কান্ডহতে শাখা এবং শাখা হতে প্রশাখা ও পত্র-পল্লব ফুটে বের হয়ে থাকে। বৃক্ষটি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়ে পড়লেও এর দূরবর্তী পাতাটি পর্যন্ত এর মূল শিকড়ের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত—ইসলামেরও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিসগুলো ঠিক তদনুরূপ। অতএব ইসলামী জীবনের যে কোন দিক ও বিভাগকে বুঝার জন্যে এর মূল শিকড়ের দিকে লক্ষ্য করা এবং একে বুঝে নেয়া আবশ্যক। এটা ছাড়া এর প্রাণবস্তু ও মূলতত্ত্ব এবং আভ্যন্তরীণ ভাবধারা কিছুতেই হৃদয়ংগম করা যেতে পারে না।

নবীদের কাজ

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত জীবন ব্যবস্থা। এটা কেবল হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রচারিত বিধানই নয়, মোটামুটিভাবে একথা কারো অজানা নয়। বস্তুত মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায় হতে যত নবীই আল্লাহর তরফ হতে এসেছেন, তাদের সকলেই একমাত্র এ বিধানেরই প্রচার করেছেন। সকল নবীই এক আল্লাহর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকার করাতে এবং মানুষের দ্বারা তারই বন্দেগী করার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। এ সম্পর্কে এরূপ সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিবর্তে গভীরভাবে বিষয়টি সম্বন্ধে গবেষণা করা আবশ্যক। আসলে এ সকল নিগূঢ় সত্য এবং গভীর তত্ত্ব পর্দার আড়ালেই লুকিয়ে রয়েছে।

বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানী দৃষ্টিতে নির্ভুলভাবে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে যে, আল্লাহর প্রভুত্ব স্বীকার করানোর উদ্দেশ্য কি? আর আল্লাহর কোন

বান্দাহ (নবী) যখন 'আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য কেহ প্রভু নেই' বলে ঘোষণা করেছেন তখন স্থানীয় আল্লাহদ্রোহী শক্তিসমূহ জংগলের বিষাক্ত কাঁটার মত তাকে বিঁধতে শুরু করেছিল কেন, তা সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করার জন্যও গভীর ও সূক্ষ্ম আলোচনা অপরিহার্য। সাধারণত নবীর এই প্রাথমিক ঘোষণার খুব সংকীর্ণ অর্থ-ই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মনে করা হয় যে, মসজিদে গিয়ে 'আল্লাহর সম্মুখে মাথা নত করে সিজদা করতে' বলাই বুঝি ছিল নবীর এই ঘোষণার মূল লক্ষ্য ; আর তারপর মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন, বাইরের যে কোন ব্যবস্থা ভিত্তিক গভর্ণমেন্টের আনুগত্য স্বীকার করা এবং তার বিধান পালন করে চলার ব্যাপারে এই ঘোষণা দ্বারা কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি।

আমি জিজ্ঞেস করি ঃ নবীর এই প্রাথমিক বাণীর অর্থ যদি শুধু এতটুকুই হতো, তাহলে দুনিয়ার কোন নির্বোধ ব্যক্তিও কি নিজের অনুগত ও আদেশানুবর্তী প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করত ? এ কারণেই আল্লাহ সম্পর্কে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও দুনিয়ার অন্যান্য শক্তির মধ্যে মূলত কোন্ বিষয়ে মতভেধ হয়েছিল এবং কোন্ ব্যাপারটা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলেছিল, তা বিশেষভাবে গবেষণা করে দেখা একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

বস্তুত কুরআন মজীদে একাধিক স্থানে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছে। যে সকল কাফের ও মুশরিকদের সংগে নবীদের সংগ্রাম চলেছিল, মূলত তারা কেউই আল্লাহকে অস্বীকার করেনি। তারা সকলেই আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করত। তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ তায়ালাই আকাশ ও পৃথিবী এই কাফের মুশরিকদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। তাঁরই হুকুম অনুযায়ী বায়ু গতিশীল। সূর্য-চন্দ্র এবং নক্ষত্র সবকিছুই তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ○ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ○ قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ○

"তাদের নিকট জিজ্ঞেস কর, পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে তা কার ? বল—যদি তোমাদের জানা থাকে—তারা বলবে ঃ উহা আল্লাহর। 'বল, একথা তোমরা ভেবে দেখ না কেন ? তাদের জিজ্ঞেস কর, সাত আসমানের প্রভু এবং মহান আরশের মালিক কে ? তারা বলবে—আল্লাহ! তুমি বল, তাহলে তোমরা তাঁকে ভয় কর না কেন ? তাদের জিজ্ঞেস কর, প্রত্যেকটি জিনিসের কর্তত্ব কার হাতে, যিনি সকলকে আশ্রয় দান করেন—যাঁর বিরুদ্ধে কেহ কাকেও আশ্রয় দান করতে পারে না, তিনি কে ? বল যদি তোমরা জেনে থাক। তারা বলবে—আল্লাহ। তুমি বল–তাহলে কোন্ ধোঁকায় তোমাদেরকে এভাবে নিক্ষেপ করা হয়েছে ?"
—(মু'মিনুন ঃ ৮৪)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ج فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط (عنكبوت : ٦١-٦٣)

"আকাশ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছে ? এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মানুগত করেছে, তা তাদের নিকট জিজ্ঞেস করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে যে, এটা সবই আল্লাহর কীর্তি। কিন্তু তবুও তারা ভ্রষ্ট হয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে ? তাদের নিকট যদি জিজ্ঞেস কর আকাশ হতে কে বৃষ্টিপাত করাচ্ছে এবং মৃত ধরিত্রীকে কে জীবন দান করছে ? তবে তারা নিশ্চয়ই বলবে যে, এটা একমাত্র আল্লাহর কাজ।" (আনকাবুত ঃ ৬১ ও ৬৩)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ -

"তাদের নিকট যদি জিজ্ঞেস কর যে, তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন ? তবে তারা নিশ্চয়ই বলবে ঃ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এটা সত্ত্বেও তারা পথ ভ্রষ্ট হয়ে কোথায় যাচ্ছে ?" (যুখরুফ ঃ ৮৭)

অতএব একথা সুস্পষ্ট জানা যায় যে, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে এবং তাঁর সৃষ্টিকর্তা, আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র মালিক হওয়ার ব্যাপারে মানব সমাজে কোন কালেই কোন মতভেদ ছিল না। জনগণ চিরদিনই একথা নিসংকোচে ও স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করত। কাজেই এসব কথার পুনঃ প্রচার এবং জনগণের দ্বারা এটা স্বীকার করার জন্য নবী পাঠাবার কোন প্রয়োজনীয়তা

নিসন্দেহে ছিল না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে, দুনিয়ায় নবীদের আগমনের কি উদ্দেশ্য ছিল ? এবং স্থানীয় শক্তি নিচয়ের সংগে তাদের কি নিয়ে সংগ্রামের সৃষ্টি হয়েছিল—এ প্রশ্নই আমাদের সম্মুখে প্রচণ্ড হয়ে দেখা দেয়।

কুরআন মজীদ এর সুস্পষ্ট জবাব দিয়েছে। কুরআন বলে ঃ নবীগণ বলতেন যে, "যিনি তোমাদের এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, বস্তুত তোমাদের 'রব' এবং 'ইলাহ'ও একমাত্র তিনিই। অতএব তাঁকে ছাড়া আর কাকেও 'রব' এবং 'ইলাহ' বলে মেনো না।' মূলত একথা নিয়েই ছিল নবীদের প্রাণান্তকর সাধনা এবং প্রতিকূল শক্তির সাথে সকল প্রকার কলহ-বিবাদ। কারণ দুনিয়ার মানুষ নবীদের উল্লিখিত বাণীকে স্বীকার করার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু এই বিবাদের মূলেই বা কি নিগূঢ় কারণ নিহিত ছিল ? 'ইলাহ' কাকে বলে ? 'রব' শব্দের দ্বারা কি বুঝান হচ্ছে ? একমাত্র আল্লাহকেই 'রব' ও 'ইলাহ' স্বীকার করার জন্য নবীদের এরূপ পৌনপুনিক প্রচেষ্টার মূল কারণ কি ? আর দুনিয়ার মানুষই বা একথা স্বীকার করতে কেন রাযী হয় না এবং এটা শুনেই বা তারা কেন যুদ্ধংদেহী বেশ ধারণ করে ?

এখানে আমি এসব প্রশ্নের জবাবই পেশ করতে চেষ্টা করব।

'ইলাহ' শব্দের অর্থ

সকলেই জানেন, 'ইলাহ' শব্দের অর্থ প্রভু—উপাস্য বা মা'বুদ। কিন্তু এ শব্দগুলোর সঠিক অর্থ বর্তমান যুগের মানুষ প্রায়ই ভুলে গিয়েছে। মা'বুদ শব্দের মূল হচ্ছে-'আবদ'। আব্দ অর্থ বান্দা-দাস ; আর ইবাদাতের অর্থ কেবল পূজা করাই নয়, বান্দাহ এবং দাস বন্দেগী ও গোলামী করে যে ধরনের জীবন যাপন করে থাকে, মূলত সেই পূর্ণ জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মকেই বলা হয় ইবাদাত। খেদমতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া, সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনের জন্য হাত বেঁধে দাঁড়ানো নিজেকে দাস মনে করে মাথা নত করা, হুকুম মেনে চলার স্বতস্ফূর্ত প্রবণতা ও আবেগে উচ্ছ্বসিত হওয়া, আনুগত্য করতে গিয়ে চেষ্টা-সাধনা ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা, নির্দেশানুযায়ী কাজ সমাধা করা, মনিবের আদেশ অনুসারে প্রত্যেকটি জিনিস উপস্থিত করে দেয়া তাঁর অতুলনীয় বিক্রম ও গভীর মহিমার সম্মুখে বিনয়াবনত হওয়া, তাঁর রচিত ও প্রদত্ত প্রত্যেকটি আইন মেনে চলা, প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ বস্তুকে পরিহার ও মূলোৎপাটিত করা তাঁর আদেশ অনুযায়ী আত্মবিসর্জন করতে প্রস্তুত হওয়া-এটাই হলো ইবাদাতের প্রকৃত অর্থ। আর মানুষ এভাবে যার ইবাদাত করে, তিনিই মানুষের আসল মা'বুদ-আর তিনিই 'ইলাহ'।

রব-এর অর্থ

'রব' শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রতিপালক ; যেহেতু দুনিয়ায় প্রতিপালকেরই আনুগত্য ও আদেশ পালন করা হয়, অতএব 'রব' শব্দের অর্থ 'মালিক' 'মনিব'ও হয়ে থাকে। এ জন্যই কোন বস্তুর মালিককে আরবী পরিভাষায় রাব্বুলমাল'—জিনিসের মালিক এবং বাড়ীর মালিককে 'রববুদ-দার' বলা হয়। মানুষ যাকে নিজের রিজকদাতা ও প্রতিপালক বলে মনে করে, যার নিকট হতে অনুগ্রহ ও দান পাবার আশা করে, যার নিকট হতে মান-সম্মান, উন্নতি ও শান্তি লাভ করার আকাংখা রাখে, যার দয়ার দৃষ্টি হতে বঞ্চিত হওয়ায় জীবন নষ্ট বা ধ্বংস হওয়ার আশংকা করে থাকে, মানুষ যাকে নিজের প্রভু, মনিব ও মালিকরূপে নির্দিষ্ট করে এবং বাস্তব জীবনে যার আনুগত্য ও আদেশ পালন করে চলে, বস্তুত সে-ই হচ্ছে তার 'রব'।

এ শব্দ দু'টির অর্থের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন এবং গভীরভাবে ভেবে দেখুন যে, মানুষের 'ইলাহ' ও 'রব' হওয়ার বলিষ্ঠ দাবী নিয়ে কে এসে দাঁড়ায় ? কোন্ শক্তি বলে থাকে যে, তোমরা আমার বন্দেগী ও ইবাদাত কর ? গাছ, পাথর, নদী, সমুদ্র, জন্তু-জানোয়ার, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্র প্রভৃতি কোন একটি প্রাকৃতিক বস্তুও কি আজ পর্যন্ত মানুষের কাছে এরূপ দাবী উত্থাপন করেছে। এগুলোর কোন একটির মধ্যেও কি এরূপ দাবী করার বিন্দুমাত্র সামর্থ আছে ?

প্রত্যেক মানুষই বুঝতে পারেন যে, এদের কোনটিই এরূপ দাবী মানুষের কাছে করতে পারে না। বস্তুত কেবল মানুষই মানুষের উপর নিজের প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য এরূপ দাবী করে থাকে—আর মানুষই তা করতে পারে। প্রভুত্বের লালসা একমাত্র মানুষের মন ও মস্তিষ্কে স্থান পেতে পারে। মানুষেরই সীমালংঘনকারী প্রভুত্ব লোভ কিংবা উদগ্র শোষণাভিলাষ তাকে ভয়ানকভাবে উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করে এবং অন্য মানুষের 'খোদা' হবার জন্য মানুষকে নিজের দাসত্বের শৃংখলে বন্দী করার জন্যে, নিজের পদতলে অন্য মানুষের মস্তক অবনত করার জন্য, তাদের উপর নিজের হুকুম ও আইন চালাবার জন্য, নিজের লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য ও মানুষকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্যই মানুষ এরূপ ক্ষমতার নেশায় মেতে উঠে। মানুষের 'খোদা' হবার মতো প্রলোভনের বস্তু মানুষ আজ পর্যন্ত অপর একটিও আবিষ্কার করতে পারেনি। যার কিছুটা শক্তি-সামর্থ বা ধন-সম্পদ কিংবা কূটবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অথবা এ ধরনের অন্য কোন জোর রয়েছে, সে-ই নিজের স্বাভাবিক ও সংগত সীমালংঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হবার জন্য, প্রভাবশালী

হবার জন্য এবং তার পরিবেশের দুর্বল, দরিদ্র, বুদ্ধিহীন বা (কোন দিক দিয়ে) নীচ ব্যক্তিদের উপর নিজের প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে।

এ ধরনের প্রভুত্বলোভী ও ক্ষমতাভিলাষী লোক দুনিয়ায় সাধারণত দু' প্রকার পাওয়া যায়। এ দু' প্রকার লোকেরা দু'টি বিভিন্ন পথ ধরে নিজ নিজ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে।

প্রথম প্রকার মানুষ অত্যন্ত দুঃসাহসী হয়ে থাকে। কিংবা তাদের নিকট খোদায়ীর দাপট প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম বর্তমান থাকে। এই শ্রেণীর লোক সরাসরিভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের খোদায়ী দাবী পেশ করে থাকে। মিসরের ফেরাউন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে নিজের বাদশাহী ও সৈন্য-সামন্তের বলে মত্ত হয়ে বলেছিল اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى। 'আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব' مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِى 'আমি ছাড়াও তোমাদের অন্য কোন প্রভু আছে বলে আমার জানা নেই।' হযরত মূসা (আ) যখন তার সম্মুখে বনী ইসরাঈলদের আযাদীর দাবী পেশ করলেন এবং তাকে বললেন যে, তুমি নিজেও ইলাহুল আলামীন-এর (সারে জাহানের রব এর) বন্দেগী কবুল কর, তখন ফেরাউন বলেছিল ঃ

وَلَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِى لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ-

"তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাকেও 'ইলাহ' রূপে স্বীকার করে লও তাহলে তোমাকে আমি গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করে দিব।"

যে বাদশাহর সাথে আল্লাহর সম্পর্কে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর তর্ক হয়েছিল, তারও অনুরূপ দাবী ছিল। কুরআন শরীফে যে ভংগীতে ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهِمُ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ م اِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ لا قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ط قَالَ اِبْرٰهِمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ط (البقر : ٢٥٨)

"যে ব্যক্তি ইব্‌রাহীমের সাথে তর্ক করেছিল, তার কথা ভেবে দেখ। উভয়ের মধ্যে তর্ক হয়েছিল এ নিয়ে যে, ইব্‌রাহীমের 'রব' কে ? এই তর্ক হয়েছিল কেন ? এ জন্য যে, আল্লাহ তাকে কোন দেশের রাজত্ব দান করেছিলেন। ইব্‌রাহীম যখন বলেছিলেন যে, জীবন ও মৃত্যু যার হাতে, তিনিই আমার রব। তখন উত্তরে সেই ব্যক্তি বলেছিল জীবন ও মৃত্যু তো আমার হাতে। ইব্‌রাহীম বললেন ঃ (আমার) আল্লাহ পূর্বদিক হতে সূর্য উদিত করেন, ক্ষমতা থাকলে তুমিই এটাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত কর। একথা শুনে সেই কাফের ব্যক্তি হতবাক ও নিরুত্তোর হয়ে গেল।"

—সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৮

চিন্তা করার বিষয় এই যে, সেই লোকটি নিরুত্তর হলো কেন ? সে তো আল্লাহকে অস্বীকার করেনি। নিখিল সৃষ্টি জগতের প্রভু আল্লাহ সূর্যের উদয়-অস্ত একমাত্র তারই বিধান মত হয়ে থাকে, একথা সে পুরোপুরিই স্বীকার করত ও মানত। বিশ্বভূবনের মালিক কে, এই প্রশ্ন নিয়ে এখানে কোন তর্ক ছিল না—মতভেদও কিছু ছিল না, তর্ক ছিল মানুষের—বিশেষ করে ইরাক ভূখণ্ডের অধিবাসীদের—মালিক কে, তা নিয়ে। সে ব্যক্তি কখনো আল্লাহ হবার দাবী করেনি, সে কেবল তার দেশবাসীর 'রব' হওয়ার দাবী করছিল মাত্র। আর এ দাবী করারও মূল কারণ শুধু এই যে, তার হাতে ছিল রাজশক্তি ও শাসন ক্ষমতা। জনগণের জান-মালের উপর তার নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্থাপিত ছিল। সে নিজে ইচ্ছামত কাউকেও ফাঁসি দিতে পারত। সে নিজের মু-খের কথাকেই 'দেশের আইন' মনে করত। সমগ্র প্রজা সাধারণের উপর তার মুখের আদেশ আইন হিসেবে চালু হয় বলে তার মনে ছিল অহংকার। এজন্যই হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কেও বলেছিল, 'আমাকে মানো' 'আমার বন্দেগী ও ইবাদাত কর।' কিন্তু হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যখন স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে, আমি একমাত্র তাঁরই ইবাদাত ও বন্দেগী করব, একমাত্র তাঁকেই 'রব' বলে মানব, যিনি সারা পৃথিবী এবং আকাশ জগতের 'রব' চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি সবকিছুই যার ইবাদাত করে। তখন ইহা শুনে সে লোকটি স্তম্ভিত হয়ে গেল। কারণ, এ লোকটিকে কি করে বশ করা যাবে, তা-ই হলো তার ভাবনা ও উদ্বেগের বিষয়।

ফেরাউন ও নমরূদ যে খোদায়ী ও প্রভুত্বের দাবী করেছিল, ইহা কেবল এই দু' ব্যক্তি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। দুনিয়ার প্রত্যেক স্থানেই প্রত্যেক শাসকেরই এরূপ দাবী ছিল এবং এখনো রয়েছে। প্রাচীন ইরানের বাদশাকে

'খোদা' বলা হতো এবং তার সম্মুখে আনুষ্ঠানিকভাবে দাসত্ব ও বন্দেগী পালন করা হতো। অথচ প্রকৃতপক্ষে কোন ইরানবাসী তাঁকে আল্লাহ মনে করতো না, আর সে নিজেও তা কখনও দাবী করত না। ভারতবর্ষেরও কয়েকটি শাসক পরিবারও নিজেদেরকে দেবতাদের বংশধর বলে মনে করত। সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজও উল্লেখিত রয়েছে। রাজাকে এখানে 'অন্নদাতা—'রাযেক' বলা হতো। এমন কি তার সম্মুখে মস্তক নত করে সিজদা পর্যন্ত করা হতো। অথচ 'পরমেশ্বর' হওয়ার দাবী কোন রাজা-ই করত না। আর প্রজারাও তাকে 'পরমেশ্বর' মনে করত না। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থাও অনুরূপ ছিল এবং আজও তা আছে। কোন কোন দেশের শাসকদের সম্পর্কে 'ইলাহ' ও 'রব'-এর সামর্থবোধক শব্দ সাধারণতভাবে প্রয়োগ করা হয়। এরূপও অনেক দেশ আছে যেখানে এ ধরনের শব্দের ব্যবহার না করলেও অনুরূপ অর্থবোধক শব্দ নিশ্চয়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খোদায়ী প্রভুত্বের এরূপ দাবীর জন্য প্রকাশ্যভাবে 'ইলাহ' বা 'রব' হওয়ার দাবী করা অপরিহার্য নয়—মুখে একথা বলারও খুব প্রয়োজন নেই যে, আমি 'ইলাহ' বা 'রব'। বরং ফেরাউন ও নমরূদ মানুষের উপর যেরূপ প্রভুত্ব ও শাসন, শক্তি ও ক্ষমতা, প্রভাব ও আধিপত্য ইত্যাদি কায়েম করেছিল, আজো যারা অনুরূপ কাজ করে, প্রকাশ্যে না হলেও মূলত তারাই 'ইলাহ' ও 'রব' হওয়ার দাবী করে থাকে। পক্ষান্তরে যারাই তাদেরকে ঐ ধরনের ক্ষমতা ও প্রভুত্বের অধিকারী বলে স্বীকার করে, মূলত তারা তাদের 'ইলাহ' ও 'রব' হওয়ার কথাই স্বীকার করে। মুখে ঐ শব্দ ব্যবহার না করলেও কোন ক্ষতি হয় না।

মোটকথা, যারা সোজাসুজিভাবে 'ইলাহ' ও 'রব' হওয়ার দাবী উত্থাপন করে তারা এক ধরনের মানুষ, আর যাদের কাছে তদনুরূপ শক্তি-সামর্থ এবং অনুরূপ দাবী স্বীকার করার প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ বর্তমান নেই, বরং যারা ধোঁকা, প্রতারণা, কূটবুদ্ধি এবং কৌশল ইত্যাদির হাতিয়ার যথেষ্ট প্রয়োগ করতে ও জনসাধারণের মন-মস্তিষ্ক আয়ত্তাধীন করতে সমর্থ, তারা আর এক ধরনের মানুষ। শেষোক্ত ধরনের লোক নিজেদের উপায়-উপকরণ যা কিছু আছে, তার দ্বারা কোন দেবতা, মৃত আত্মা, কোন ভূত, কবর, গ্রহ কিংবা বৃক্ষকে 'ইলাহ'-এর মর্যাদা দান করে এবং মানুষকে বলে ঃ এটা তোমাদের ক্ষতি বা কল্যাণ করতে সমর্থ, এটা তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে, এটা তোমাদের রক্ষক ও সাহায্যকারী এটাকে খুশি না করলে এটা তোমাদের দুর্ভিক্ষ, রোগ, শোক, দুঃখ ও বিপদ-আপদে নিমজ্জিত করে দেবে। আর

এটাকে খুশি করে তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার প্রার্থনা করলে এটা তোমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু এদেরকে খুশী করার এবং তোমাদের দুরবস্থা ও দুর্গতি দূরীভূত করার দিকে এদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা—এদেরকে সন্তুষ্ট করার কার্যকরী পন্থা আমরা জানি। এদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছবার অবলম্বন আমরাই হতে পারি। আমাদের নেতৃত্ব মেনে লও, আমাদের খুশী এবং তোমাদের জান-মাল আব্রু সবকিছুরই উপর আমাদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্বীকার করে লও–ফলে অসংখ্য নির্বোধ মানুষ প্রতারণার এই দুশ্ছেদ্য জালে জড়িত হয়ে পড়ে এবং এই ধরনের মিথ্যা খোদার আশ্রয়ে ঐসব পুরোহিত পূজারী ও যাজকদের একচেটিয়া প্রভুত্ব ও খোদায়ী স্থাপিত হয়।

এদের মধ্যে আর একদল লোক আছে, যারা নানা প্রকার যাদুমন্ত্র, ফাল ও গণনা, তাবিয-তুমার ও মন্ত্র ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করে। আর কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা নিজেরা একদিকে আল্লাহর বন্দেগী স্বীকার করে এবং অপরদিকে মানব সাধারণকে নিজেদের দাস বানাবার চেষ্টা করে। তারা জনগণকে বলে যে, তোমরা সরাসরিভাবে নৈকট্য লাভ করতে পারো না, তাঁরা নৈকট্য লাভ করার জন্য আমরাই একমাত্র বাহন বা মাধ্যম। ইবাদাতের যাবতীয় অনুষ্ঠান আমাদের মাধ্যমেই পালিত হতে পারে। কাজেই জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় ধর্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠান আমাদের হাতে–আমাদের সাহায্যেই পালিত হবে। আর একদল লোক আবার আল্লাহর কিতাব একচ্ছত্রভাবে দখল করে বসে, জনসাধারণকে এর জ্ঞান হতে একেবারেই বঞ্চিত করে রাখে, আর নিজেরা নিজেদেরকে 'আল্লাহর ভাষ্যকার' মনে করে হালাল-হারাম সংক্রান্ত নির্দেশ দিতে শুরু করে। তাদের মুখের কথাই 'দেশের আইন' হয়ে থাকে এবং তারা মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের আদেশানুবর্তী করে নেয়। প্রাচীনকাল হতে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে যেসব পৌরহিত্যবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পোপতন্ত্র চলে এসেছে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় এখনো বর্তমান রয়েছে, এটাই সে সবের মূল তত্ত্ব। এরই দৌলতে বিভিন্ন পরিবার, বংশ, গোত্র বা শ্রেণী জনগণের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের কলংক ছাপ স্থাপন করেছে।

বিপর্যয়ের মূল কারণ

এ দৃষ্টিতে চিন্তা করলে নিসন্দেহে জানা যায় যে, মানুষের উপর মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভুত্বই হচ্ছে দুনিয়ার সর্বকালের, সর্বজাতির ও সকল দেশের সকল প্রকার অশান্তি ও বিপর্যয়ের মূল কারণ। এটাই সমস্ত ভাংগন ও বিপর্যয়ের প্রধান উৎস। এটা হতে আজও অসংখ্য বিষাক্ত ধারা জন্মলাভ করে

দিক-দিগন্তে প্রবাহিত হচ্ছে। আল্লাহ তো স্বতঃই সকল মানুষের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্য ও ভাবধারা পূর্ব হতেই যথাযথরূপে জানেন। আর হাযার হাযার বছরের অভিজ্ঞতা হতে আমরাও নিসন্দেহে জানতে পেরেছি যে, মানুষ অন্য একজনকে—সে যে-ই হোক না কেন—'ইলাহ' ও 'রব' স্বীকার না করে কিছুতেই থাকতে পারে না। বস্তুত কাউকেও 'রব' 'ইলাহ' স্বীকার না করে মানুষের জীবনই চলতে পারে না। কেউ যদি আল্লাহকে 'ইলাহ' ও 'রব' বলে স্বীকার না-ও করে তবুও কাউকেও 'ইলাহ' ও 'রব' স্বীকার না করে মানুষের নিস্তার নেই। অধিকন্তু, এক আল্লাহকে 'রব' ও 'ইলাহ' বলে স্বীকার না করলে তখন অসংখ্য 'রব' তার উপর চেপে বসতে পারে ; বস্তুত এক আল্লাহকে 'ইলাহ' ও 'রব' স্বীকার না করার এটাই অনিবার্য পরিণাম।

চিন্তা করে দেখুন, সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক ব্যুরোর (Political Bureau) সদস্যগণ সমগ্র রুশবাসীদের 'রব' ও 'ইলাহ' নয় কি ? আর পার্টির প্রধান বর্তমানে তার স্থলাভিষিক্ত এ একাধিক 'রব' ও 'ইলাহ'র শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম 'রব' ও 'ইলাহ' নয় ? বস্তুত রুশবাসীদের এক 'পরমেশ্বর' ও সর্বশ্রেষ্ঠ খোদার (পার্টি প্রধান) ছবি সসম্মানে রক্ষিত হয়নি এমন একটি গ্রাম ও একটি কৃষি ফার্মও সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় রাশিয়া পোল্যান্ডের যে অংশ অধিকার করেছিল, অনেকেই তা হয়তো জানে না তথায় ষ্ট্যালিনের প্রতিকৃতি হাযার হাযার সংখ্যায় আমদানী করা হয়েছিল, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে তা পৌছান হয়েছিল, কিন্তু কেন ? বস্তুত এর মূলে একটি বিরাট উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। এরূপ প্রতিকৃতি দ্বারা জনগণ যদি প্রভাবান্বিত হয়, তবে উত্তরকালে তথায় বলশেভিক ধর্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সহজ হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই ঃ এ একটি মানুষের প্রতি এতবেশী (অস্বাভাবিক ও অতি মানবিক) গুরুত্ব আরোপ করা হয় কিসের জন্য ? বিশেষ কোন ব্যক্তি যদি গোটা জাতির (Community) প্রতিনিধিও হয়ে থাকে তবুও কোটি কোটি মানুষের মন, মস্তিষ্ক ও আত্মার উপর সেই এক ব্যক্তির নিরংকুশ প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হবে কেন—কোন কারণে ? তার ব্যক্তিত্বের প্রতিপত্তি ও পরাক্রম তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম দেশের জনসাধারণের স্নায়ু-মন্ডলী ও রক্ত-বিন্দুতে কেন প্রবাহিত করা হবে ? বস্তুত এরূপেই দুনিয়াতে ব্যক্তিতন্ত্র কায়েম হয়ে থাকে—এই উপায়েই মানুষ মানুষের 'প্রভু' ও 'খোদা' হয়ে বসে। প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশে এ পন্থায়ই ফেরাউন ও নমরূদ এবং জার ও কাইজার তন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে থাকে।

বিগত যুদ্ধের সময় ইটালীর অবস্থাও ছিল অনুরূপ। 'ফ্যাসিষ্ট গ্র্যান্ড কাউন্সিল' সে দেশের অসংখ্য 'ইলাহ'র মিলিত রূপ এবং মুসোলিনী ছিলেন সেখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ 'রব' ও 'ইলাহ'। জার্মানীর নাৎসী দলের নেতৃবৃন্দ ছিল অসংখ্য 'ইলাহ'র সমষ্টি, আর হিটলার ছিল তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ 'ইলাহ'। গণতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও বৃটেন 'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের' ডিরেকটরগণ এবং তথাকার কয়েকজন উঁচু দরের লর্ড হচ্ছেন সমগ্র দেশের খোদা। আমেরিকার 'ওয়ালষ্ট্রীট'-এর মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি সমগ্র দেশের 'ইলাহ' ও 'রব' হয়ে বসে আছে।

মোটকথা যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন, দেখতে পাবেন, কোথাও এক জাতি অন্য জাতির 'ইলাহ' হয়ে বসে আছে, কোথাও এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর 'ইলাহ' আর কোথাও একদল অন্য সমস্ত দলের 'ইলাহ' ও 'রব'-এর ভূমিকা দখল করে আছে। কোথাও কোন ডিক্টেটর مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ غَيْرِى "আমি ছাড়া তোমাদের আর কেউ 'ইলাহ' আছে বলে আমি জানি না" বলে নিরংকুশ কর্তৃত্বের দাবী পেশ করছে। বস্তুত মানুষ দুনিয়ায় কোন স্থানেই কোন না কোন 'ইলাহ' ছাড়া বেঁচে থাকতে পারছে না।

কিন্তু মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব (খোদায়ী) স্থাপিত হওয়ার পরিণাম যে কতখানি মারাত্মক হয়ে থাকে তাও ভেবে দেখা আবশ্যক। একজন হীন, নীচ, মূর্খ ব্যক্তিকে কোন এলাকার পুলিশ কমিশনারের মর্যাদা ও ইখতিয়ার দান করলে, কিংবা একজন অজ্ঞ ও সংকীর্ণমনা ব্যক্তিকে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে দিলে এর যে বাস্তব ফল হয়ে থাকে, এই ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ পরিণাম হতে বাধ্য। প্রথমত খোদায়ী ও প্রভুত্বের নেশাটাই হচ্ছে অত্যন্ত মারাত্মক। এ মদ সেবনের পর কোন মানুষই প্রকৃতিস্থ থাকতে পারে না। আর যদি কেউ সুস্থ প্রকৃতির থাকেও, তবুও 'খোদায়ীর' কর্তব্য ও দায়িত্ব যথারীতি পালন করার জন্য যে জ্ঞান, যে নিঃস্বার্থতা নিষ্কলুষতা এবং সর্বোপরি যে নিরপেক্ষতা অপরিহার্য, মানুষ তা কোথায় পাবে ? এ জন্যেই, যেখানে যেখানে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব 'খোদায়ী' স্থাপিত হয়েছে, তথায় যুলুম-অত্যাচার, শোষণ-পীড়ন, অশান্তি-উচ্ছৃংখলা, অবিচার-অসাম্য, ক্ষমতার অপব্যবহার কোন না কোনভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে—এর ব্যতিক্রম কোথাও নেই। মানুষের প্রভুত্বের অধীন-সমাজে মানুষের আত্মা তার স্বাভাবিক স্বাধীনতা হতে নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকে। মানুষের মন ও মস্তিষ্কের উপর, তার জন্মগত শক্তি, সামর্থ ও যোগ্যতা প্রতিভার উপর কঠিন বাঁধন স্থাপিত হয়,

মানব ব্যক্তিত্বের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের পথে জগদ্দল পাথর এসে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) যে কত বড় সত্য কথা বলেছিলেন তা অতি সহজেই বুঝা যায় ঃ

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمُ الشَّيٰطِيْنُ فَاَجْتَالَتْهُمْ مِنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا اَحْلَلْتُ لَهُمْ (حديث قدسى)

—"মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন—"আমি মানুষকে সুস্থ ও সঠিক প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু পরে শয়তান তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। প্রকৃতির সরল ও সঠিক পথ হতে তাদেরকে বিচ্যুত ও ভ্রষ্ট করে দিল। আর আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছিলাম, এই শয়তান সেসব জিনিসকেই তাদের পক্ষে হারাম করে দিল, তা হতে তাদেরকে বঞ্চিত করল।"

উপরে বলেছি, মানুষের সমগ্র দুঃখ-মুসীবত, সমস্ত ভাংগন-বিপর্যয়, সমস্ত অশান্তি ও বঞ্চনার এটাই হচ্ছে একমাত্র মূল কারণ। মানবতার মুক্তি ও প্রগতির পথে এটাই হচ্ছে প্রধানতম ও প্রকৃত বাধা। মানুষের নৈতিক চরিত্র ও আত্মাকে মানুষের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শক্তি নিচয়কে মানুষের সমাজ ও তামাদ্দুনকে মানুষের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে—এক কথায় গোটা মানবতাকে এই মারাত্মক ব্যধিই কঠিন মৃত্যুর গহবরে ঠেলে দিয়েছে। প্রাচীনকাল হতে এই 'ঘুন'ই মানবতাকে অন্তসারশূন্য করে দিয়েছে—আজ পর্যন্ত এটাই তাকে দুর্বল ও শক্তিহীন করে রেখেছে। কিন্তু এ রোগের চিকিৎসা কিসে হতে পারে? ইসলামের দৃষ্টিতে এই রোগের একমাত্র প্রতিরোধ এই যে, দুনিয়ার সমস্ত 'ইলাহ' ও সমগ্র 'রব'কে মানুষ স্পষ্ট ভাষায় ও উদাত্ত কণ্ঠে অস্বীকার করবে। বস্তুত মানবতার উক্ত মারাত্মক রোগের অন্য কোন চিকিৎসাই নেই। এ ছাড়া মানুষের মুক্তির আর কোন পথ নেই—থাকতে পারে না। কারণ, নাস্তিক হয়েও মানুষ অসংখ্য 'ইলাহ' ও 'রব' হতে নিষ্কৃতি পেতে পারে না, দুনিয়ার বিভিন্ন নাস্তিক জাতি বা দলের ইতিহাস হতেই একথা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয়েছে।

আম্বিয়ায়ে কেরামের আসল কাজ

বস্তুত আম্বিয়ায়ে কেরাম এই বুনিয়াদী সংস্কার সাধনের জন্যই দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন, মানবতার এই মৌলিক চিকিৎসাই তাঁরা করেছেন।

মানুষের উপর হতে মানুষের প্রভুত্বকে নির্মূল করার জন্যই তাঁরা এসেছিলেন। মানুষের যুলুম-পীড়ন হতে, মিথ্যা ও কৃত্রিম 'খোদার' দাসত্বজাল হতে এবং শোষণ ও কুশাসন হতে মুক্তিদানের জন্য তাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। মানবতার সীমালংঘকারী মানুষকে সীমার মধ্যে সংঘবদ্ধ করা মানবতার সীমা হতে বিচ্যুত মানুষকে হস্ত ধারণ করে এর সীমায় উন্নীত করা এবং নিখিল মানবতাকে এক সুবিচারপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার অনুসারী ও অনুগামী করে দেয়াই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও জীবন ব্যবস্থায় মানুষ মানুষের প্রভু (খোদা) হবে না,—মানুষ মানুষের দাস হবে না। সকল মানুষ হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দাসানুদাস। প্রথম দিন হতে শেষ পর্যন্ত সকল নবীরই এই পয়গাম ছিল মানবতার প্রতি ঃ

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ۔

—"হে মানুষ। আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ 'ইলাহ' নেই।"(সূরা হুদ ঃ ৮৪)

হযরত নূহ, হযরত হুদ, হযরত সালেহ, হযরত শোয়াইব—সকলেই এ একই কথা বলেছিলেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-ও একথাই ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ ق وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ج رَبُّ السَّمٰوٰتِ

وَلاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (ص : ٦٥ـ ٦٦)

—"আমি তোমাদের সতর্ক ও সাবধান করতে এসেছি মাত্র। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের 'ইলাহ' কেউ নেই, তিনি এক–অদ্বিতীয়, তিনি সর্বজয়ী, তিনি আকাশ, পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থ সমস্ত কিছুরই রব।"

(সূরা সোয়াদ ঃ ৬৫-৬৬)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَلاَرْضَ ... وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ط اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط (الاعرف ـ ٥٤)

—"আল্লাহই তোমাদের রব, সন্দেহ নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্র সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। সাবধান ! সৃষ্টিও তাঁর—প্রভুত্বও তাঁরই হবে।" (সূরা আরাফ ঃ ৫৪)

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ـ (الانعام ـ ١٠٢)

—"তিনিই আল্লাহ—তিনিই তোমাদের রব। তিনি ছাড়া আর কেউ (রব) নেই, তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।" (সূরা আল আনয়াম ঃ ১০২)

وَمَا اُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ (البينة ـ ٥)

–"তাদেরকে সবকিছু ছেড়ে—সকল দিক হতে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করা এবং তাঁরই আনুগত্য করে চলার আদেশ করা হয়েছে মাত্র।" (সূরা আল বাইয়্যেনা ঃ ৫)

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط

—"আস, এমন একটি কথা গ্রহণ করি, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একেবারে সমান। তাহলো এই যে, আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কারো বন্দেগী করব না, কর্তৃত্বের ব্যাপারে অন্য কাকেও শরীক বা অংশীদার বলে স্বীকার করব না। এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যেও কেউ কাকেও 'রব' হিসেবে মানব না—এক আল্লাহ ছাড়া।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪)

বস্তুত এই ঘোষণাই মানুষের আত্মা, বুদ্ধি-চিন্তা, বিবেক-মানসিক ও বৈষয়িক শক্তিনিচয়কে যুগান্তকালের গোলামীর বন্ধন হতে মুক্ত করেছে ; যেসব দুর্বহ বোঝার দুরন্ত চাপে তাদের স্কন্ধচূর্ণ ও নত হচ্ছিল, যার তলে পড়ে তারা নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল তা দূর করে দিয়েছে। বিশ্বমানবতার জন্য এটা ছিল প্রকৃত স্বাধীনতার ইশ্‌তেহার। হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর এই অতুলনীয় কীর্তির কথা কুরআন মজীদেও বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ـ

–"নবী মানুষের উপরস্থ সকল বোঝা দূর করে দেন এবং তার সকল প্রকার বাঁধনকে ছিন্ন করেন।"

রাষ্ট্রনীতির গোড়ার কথা

আম্বিয়ায়ে কেরাম জীবনের জন্য যে ব্যবস্থা উপস্থাপিত করেছেন, উল্লেখিত মূল বিশ্বাসই হলো এর কেন্দ্র ও পাদপিঠ। ইসলামী রাষ্ট্র দর্শনের ভিত্তিও এরই উপর স্থাপিত। ইসলামী রাষ্ট্রনীতির প্রথম কথা এই যে, আইন রচনা, নির্দেশ দান ও বিধান প্রণয়নের কোন অধিকারই মানুষের নেই—না কোন ব্যক্তির, না কোন সমষ্টির। সকলের নিকট হতেই এই অধিকার কেড়ে নিতে হবে। একজন নির্দেশ দিবে, অন্য মানুষ তা নির্বিচারে মেনে নিবে, এবং পালন করবে, একজন বা একদল আইন রচনা করবে আর অপর লোক অন্ধভাবে এর অনুসরণ করবে—এরূপ অধিকার কোন মানুষকে দেয়া যেতে পারে না ; বস্তুত এই অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্যই রক্ষিত।

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ـ

—"আল্লাহ ছাড়া আর কারো নির্দেশ দানের ও আইন রচনার অধিকার নেই। তাঁরই আদেশ এই যে, আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগী বা দাসত্ব কবুল করো না, বস্তুত এটাই সঠিক ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা।"

(সূরা ইউসুফ ঃ ৪০)

يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ط

—"লোকেরা জিজ্ঞেস করে ঃ কর্তৃত্বে আমাদেরও কোন অংশ আছে কি ? —বল হে মুহাম্মাদ (সা), অধিকার ও কর্তৃত্বের সবটুকুই আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৪)

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ ـ

—"নিজেদের মুখে যা আসে, মিছামিছি তাই বলে দিও না যে, এটা হালাল আর এটা হারাম।" (সূরা আন নহল ঃ ১১৬)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ (مائده ـ ٤٥)

—"আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারা আইন রচনা করে না—হুকুমাত পরিচালনা করে না, মূলত তারাই যালেম।"

(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৫)

এই আয়াতসমূহ হতে নিসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রভুত্ব ক্ষমতা ও (Sovereignty) কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট অন্য কারো এই অধিকার

নেই। আইন রচয়িতা (Law Giver) কেবলমাত্র আল্লাহ। আদেশ এবং নিষেধ করার অধিকার কোন মানুষেরই নেই, এমনকি কোন নবীরও এই ইখতিয়ার নেই। নবী নিজেও একমাত্র আল্লাহরই নির্দেশ মেনে চলে থাকেন।

اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ ط (انعام ـ ٥٠)

—"আমার নিকট যে ওহী নাযিল হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করে চলি।" (সূরা আল আনয়াম ঃ ৫০)

জনসাধারণকে শুধু অনুসরণ করে চলতে হয় এবং তাও এই জন্য যে, নবী কখনও নিজের হুকুম পেশ করেন না। তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর দেয়া নির্দেশ জনগণের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকেন। কাজেই নবীর অনুসরণ ছাড়া আল্লাহর হুকুম পালনও সম্ভব নয়।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط (النساء ـ ٦٣)

—"আমি যখনই কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, আল্লাহর অনুমতি (Sanction) অনুসারে তাঁর অনুসরণ করার জন্য তাঁকে পাঠিয়েছি।" (সূরা আন নিসা ঃ ৬৩)

اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ج (الانعام ـ ٨٩)

—"এই নবীদের আমি কিতাব দিয়েছি, হুকুম দেয়ার (Authority) বা অধিকার দিয়েছি এবং নবুয়াত দান করেছি।" (সূরা আল আনয়াম ঃ ৮৯)

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ ـ

—"আল্লাহ একজনকে কিতাব, হুকুম দেয়ার অধিকার এবং নবুয়াত দান করবেন, তারপর সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য মানুষকে নিজের বান্দাহ বা দাস হওয়ার জন্য আহবান করবে এটা কোন মানুষই করতে পারেনি। বরং নিখিল মানুষকে আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার জন্যই দাওয়াত দেয়া—আদেশ করাই তার একমাত্র কর্তব্য।"

উল্লেখিত আয়াতসমূহ হতে প্রমাণ হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অপরিহার্য ঃ

এক ঃ কোন ব্যক্তি, বংশ-পরিবার, শ্রেণী বা দল, এমনকি রাষ্ট্র ও প্রভুত্বের (Sovereignty) অধিকারী নয়। প্রভু একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা। তিনি ছাড়া অন্য সবকিছুই আল্লাহ্র দাসানুদাস ও প্রজা মাত্র।

দুই ঃ আইন রচনা ও বিধান-প্রণয়নের অধিকারও আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। সমগ্র মুসলমান মিলেও নিজেদের জন্য কোনরূপ আইন রচনা করতে পারে না, আর আল্লাহ্র দেয়া আইনের কোনরূপ পরিবর্তন বা সংশোধন করারও কোন অধিকার রাখে না।

তিন ঃ আল্লাহ্র তরফ হতে নবী (সা) যে বিধান দুনিয়ায় পেশ করেছেন, তাই ইসলামী রাষ্ট্রের চিরন্তন ভিত্তিগত আইন। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক সরকার কেবল আল্লাহ্র আইন জারি করবে। আর নিছক এই জন্যই তা নাগরিকদের আনুগত্য পাবার অধিকারী হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ

পূর্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিত্তিতে চিন্তা করলে প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারা যাবে যে, এটা আর যাই হোক—গণতন্ত্র (Democracy) কিছুতেই নয়। কারণ যে ধরনের শাসনতন্ত্রে দেশের নাগরিকদের নিরংকুশ প্রভুত্বের অধিকার স্বীকৃত হয়, রাজনৈতিক পরিভাষায় তাকেই গণতন্ত্র বলে। সেখানে জনগণের মতেই আইন বিরচিত হয়, জনগণের মতেই আইনের রদ-বদল হয়। তারা ইচ্ছামত আইন জারী করতে পারে, আবার বিধিবদ্ধ আইনকে তারাই বাতিল করতে পারে। কিন্তু ইসলামে—ইসলামী রাজনীতিতে এর বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কাজেই উল্লেখিত অর্থে ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে 'গণতন্ত্র' বলা যেতে পারে না। (যাঁরা বলেন তাঁরা মারাত্মক ভুল করেন—অনুবাদক)

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধিকতর সঠিক ও সুষ্ঠু নাম হতে পারে, 'হুকুমাতে ইলাহীয়া'—আল্লাহ্র শাসন ব্যবস্থা। ইংরেজী পরিভাষায় এটাকে 'থিওক্র্যাসী' (Theocracy) বলা হয়ে থাকে ; কিন্তু থিওক্র্যাসী বলতে ইউরোপবাসী যা বুঝে থাকে ; ইসলামী থিওক্র্যাসী এটা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। ইউরোপীয় থিওক্র্যাসীতে নির্দিষ্ট একদল ধর্মযাজক (Priest Class) আল্লাহ্র নামে নিজেদের মনগড়া আইন জারী করে থাকে* এবং কার্যত নিজেদেরই প্রভুত্ব সাধারণ নাগরিকদের উপর স্থাপন করে। এই ধরনের শাসন

* খৃষ্টান পাদ্রী ও পোপদের নিকট হযরত ঈসা (আ)-এর কয়েকটি নৈতিক শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নেই। মানুষের বাস্তব ধর্ম ও সামাজিক জীবনের জন্য কোন বিধান মূলত তাদের নিকট ছিল না। এ জন্য তারা নিজেদের মর্জীমত নিজেদের লালসা ও ইচ্ছা-বাসনা অনুসারে আইন বানাতো এবং আল্লাহর দেয়া আইন বলে তা জারী করত।

ব্যবস্থাকে 'ইসলামী হুকুমাত' বলার পরিবর্তে 'শয়তানী হুকুমাত' বলাই অধিকতর যুক্তিগত। অন্য দিকে ইসলাম যে 'থিওক্র্যাসী' উপস্থাপিত করে, তার পরিচালন ভার বিশেষ কোন ধর্মীয় দলের উপর ন্যস্ত হয় না, তা দেশের সাধারণ মুসলমানদের হাতেই অর্পিত হয়ে থাকে। তবে জনসাধারণ এটাকে নিজেদের মর্জীমত না চালিয়ে—চালায় আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ অনুসারে। এর নামকরণের জন্য যদি আমাকে কোন নতুন পরিভাষা রচনার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে আমি এই ধরনের শাসন ব্যবস্থা ও পদ্ধতিকে (Theo Democracy) বা 'আল্লাহর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করব। কারণ, এতে আল্লাহর উচ্চতর ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের (Paramountcy) অধীন মুসলমানদেরকে সীমাবদ্ধ প্রভুত্বের অধিকার (Limited Popular Sovereignty) দান করা হয়েছে। এতে শাসন বিভাগ (Executive) মুসলিম জনসাধারণের ভোটেই নির্বাচিত হবে, মুসলমানই এটাকে পদচ্যুতও করতে পারবে, এ ছাড়া শাসন শৃংখলা স্থাপনের যাবতীয় ব্যাপার এবং যেসব বিষয় সম্পর্কে আল্লাহর শরীয়াত স্পষ্ট বিধান দেয়নি মুসলমানদের সম্মিলিত মতামত (ইসলামী পরিভাষায় যাকে বলা হয়–'ইজমা') অনুসারেই সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। আল্লাহর আইনের ব্যাখ্যা, বাস্তব প্রয়োগ ও নীতি নির্ধারণও বিশেষ কোন শ্রেণী বা অংশ কিংবা গোত্রের একাধিকারভুক্ত নয়। নির্বিশেষে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যারা ইজতেহাদী প্রতিভা সম্পন্ন তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা দান প্রসংগে কথা বলার অধিকারী। এ দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে ঃ এতে গণতন্ত্রের মর্যাদা পুরোপুরিই রক্ষিত হয়েছে, কিন্তু উপরে যেমন বলেছি—আল্লাহ ও রাসূলের আইনের ব্যাপারে কোন প্রকার রদ-বদল করার বিন্দুমাত্র অধিকার কারো নেই। কোন ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতি, আইন পরিষদ, মুজতাহিদ, আলেম বা আল্লামা, এক কথায় সমগ্র মুসলমান মিলিত হয়েও তা করতে পারে না। এই হিসেবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বা রাজনীতিকে 'থিওক্র্যাসী' বলা যেতে পারে।

একটি প্রশ্ন

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের এরূপ সীমা নির্দেশ করা হয়েছে কেন, এই সীমা ও বিধি-নিষেধের স্বরূপই বা কি, পরবর্তী আলোচনা শুরু করার পূর্বে এখানেই তার উত্তর এবং সামান্য ব্যাখ্যা পেশ করা আবশ্যক মনে করি। প্রশ্নকারী বলতে পারে যে, এরূপ করে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক এবং মনের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছেন, অথচ একটু পূর্বেই একথা

প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষকে বুদ্ধি-জ্ঞান ও চিন্তার পরিপূর্ণ আযাদী দান করেছেন। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, আইন রচনার অধিকার আল্লাহ তায়ালা নিরংকুশভাবে নিজের হাতেই রেখেছেন, তাতে কোনরূপ সংশয় নেই ; কিন্তু তা তিনি মানুষের স্বাভাবিক জন্মগত স্বাধীনতাকে হরণ করার জন্য করেননি, করেছেন মানুষের অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য। মানুষের ভ্রান্ত পথ হতে ফিরিয়ে রাখা এবং নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করা হতে বিরত রাখাই এরূপ সীমা নির্ধারণ করার মূল উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্যের যে তথাকথিত গণতন্ত্রে সার্বজনীন প্রভুত্বের সুযোগ থাকে বলে গালভরা দাবী করা করা হয়, এখানে তার একটু যাচাই বা সমালোচনা করে দেখা দরকার। যেসব লোকের পারস্পরিক মিলনে রাষ্ট্ররূপ পরিগ্রহ করে, তাদের সকলেই কখনও আইন রচনা করে না, অথবা সকলেই একত্রিত হয়ে কোন আইন রচনা করে না। বাস্তব ক্ষেত্রে কার্য পরিচালনার নিমিত্ত নির্দিষ্ট কয়েকজন লোককে প্রভুত্ব ও শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়—করতেই হয়। তারা জনগণের পক্ষ হতেই আইন রচনা করে এবং তা জারী করে থাকে। এই উদ্দেশ্যেই নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। এই নির্বাচন যুদ্ধে সেসব লোকই সাধারণত জয়লাভ করে থাকে, যারা অর্থবল, জ্ঞান, বিদ্যা, শঠতা, প্রতারণা, মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা প্রভৃতি হাতিয়ার ব্যবহার করে জনগণকে প্রতারিত করতে সমর্থ হয়। পরিণামে জনগণের ভোটে এরা জনগণের 'ইলাহ' পদে জেঁকে বসে। অতপর তারা জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য নয়—কেবল নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই আইন রচনা করেন এবং জনগণ প্রদত্ত শক্তি প্রয়োগ করে সেসব আইন জারী করে। বস্তুত গণতন্ত্রের এই অভিশাপ ইউরোপ, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড এবং গণতন্ত্রের স্বর্গ বলে কথিত এবং পরিচিত অন্যান্য সকল দেশের উপর স্থাপিত হয়ে আছে।

গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের মর্জী অনুসারে আইন রচিত হয়, তবুও বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে একথা নিসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, জনগণ নিজেরাও সঠিকভাবে বুঝতে পারে না, কিসে তাদের স্বার্থ আর কিসে নয় ? মূলত এটা মানুষের জন্মগত দুর্বলতা সন্দেহ নেই। মানুষ তার জীবনের অসংখ্য ব্যাপার প্রকৃত সত্য এবং তত্ত্বের অনেক দিক দেখতে পায় বটে ; কিন্তু অনেক দিক আবার তার চোখের অন্তরালেও থেকে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ভাল-মন্দ সম্পর্কে যে ফায়সালা (Judgment) করে, সাধারণত তা পক্ষপাতমূলক না হয়ে পারে না। মানুষের উপর তার হৃদয়াবেগ, উচ্ছ্বাস ও লালসা-বাসনার প্রবল

আধিপত্য বিদ্যমান। নিছক বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিগত দিক দিয়ে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত খুব কম লোকই করতে পারে। অনেক সময় এটাও দেখা যায় যে, নিখুঁত বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রমাণিত ব্যাপারগুলোকেও মানুষ উচ্ছ্বাস-আবেগের প্রবল চাপে জলাঞ্জলী দিয়ে বসে। এটা প্রমাণের জন্য আমি অসংখ্য উদাহরণ পেশ করতে পারি ; কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর অনাবশ্যক বৃদ্ধির ভয়ে আমি শুধু একটি মাত্র উদাহরণ পেশ করতে চাই। আমেরিকায় মদ্যপান নিরোধ আইন (Prohibition Law) রচনা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং নিছক বুদ্ধির মানদণ্ডে একথা সন্দেহাতিতরূপে প্রমাণিত হয়েছিল যে, মদ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। মন, বুদ্ধি ও বিবেক শক্তির উপর এর মারাত্মক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। মানব সমাজে এটা ভাংগন ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এসব তত্ত্ব ও সত্য সমর্থন করেই আমেরিকার জনমত একদা শরাব নিষিদ্ধকরণ আইন পাশ করার সিদ্ধান্ত করেছিল। অতপর জনগণের ভোটেই উক্ত আইন আবার পরিবর্তিত হয়েছিল।

এই আইন কার্যত যখন জারী করা হলো, তখন আইন প্রণয়নকারী জনগণই এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উক্ত আইন জারী হওয়ার পর নিকৃষ্ট হতেও নিকৃষ্টতর শরাব অবৈধভাবে তৈয়ার করতে লাগল এবং জনগণ গোপনে গোপনে তা পান করতে লাগল। অবস্থা এতদূর মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, অতপর সে দেশে পূর্বাপেক্ষা কয়েকগুণ বেশী মদ্যপান হতে লাগল। পাপ ও অপরাধের বন্যা অধিকতর প্রবল আকার ধারণ করল। সর্বশেষ সেই জনগণের ভোটেই আবার নিষিদ্ধ শরাবকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হলো—হারামকে কার্যত হালাল করে দেয়া হলো। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধির দিক দিয়ে শরাব পান উপকারী প্রমাণিত হয়েছিল বলেই যে এর বিধি বদলিয়ে গেল, তা নয়। আসলে ব্যাপার ছিল এই যে, জনগণ অজ্ঞতাপ্রসুত লোভ-লালসার দাসানুদাসে পরিণত হয়েছিল। তাদের নফসের শয়তানকে তারা নিজেদের প্রভু ও 'বিধানদাতা' বলে স্বীকার করেছিল। নিজেদের মনের লালসাকেই তারা 'ইলাহ' রূপে বরণ করে নিয়েছিল। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা চূড়ান্তভাবে সমর্থিত শরাব নিষিদ্ধকরণ আইনকেই তারা নফসের দাসত্ব করতে গিয়ে পরিবর্তন করে নিয়েছিল এ ধরনের উদাহরণ আরও অনেক দেয়া যেতে পারে ? এসব উদাহরণ হতে পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয় যে, আইন রচয়িতা (Legislator) হওয়ার যোগ্যতা মূলত মানুষের নেই। আল্লাহকে অস্বীকার করার পর অন্যান্য 'ইলাহদের' দাসত্ব ও বন্দেগী হতে তারা যদি মুক্তি পায়

তবুও তাদের নিজেদের নফসের খাহেসের দাস হতেই হবে। নিজেদের নফসের শয়তানকে তারা নিজেদের 'ইলাহ' রূপে স্বীকার করে এর অনুসরণ অবশ্যই করবে। কাজেই তাদের স্বার্থের জন্য তাদেরই স্বাভাবিক আযাদী সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সীমা নির্ধারণ অপরিহার্য সন্দেহ নেই।

এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থায় কতগুলো বিধি-বিষেধ আরোপ করেছেন। ইসলামী পরিভাষায় একে 'হুদুদুল্লাহ' বা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা (Divine Limits) বলে অভিহিত করা হয়। মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগের ভারসাম্য এবং সামগ্রিক সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্যই এ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা মূলত কতগুলো মূলনীতি, নিয়ম-প্রণালী, বিধি-নিষেধ এবং আইন-কানুনের সমষ্টি মাত্র। এগুলোর দ্বারা মানুষের স্বাধীনতার সর্বশেষ সীমা নির্ধারিত হয়েছে। মানুষকে বলা হয়েছে এ সীমার মধ্যে থেকে খুঁটিনাটি ও আনুসংগিক ব্যাপারসমূহের কায়দা-কানুন (Regulation) রচনা করার অধিকার তোমাদের আছে বটে ; কিন্তু এ সীমালংঘন বা অতিক্রম করার তোমাদের কোনই অধিকার নেই। পরন্তু এ সীমালংঘন করলেই তোমাদের শান্তি-শৃংখলা এবং ভারসাম্য চূর্ণ ও বিপর্যস্ত হবে।

আল্লাহর সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্য

উদাহরণ স্বরূপ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উল্লেখ করা যেতে পারে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার, যাকাত আদায়ের অনিবার্যতা, সূদ-ঘুষের নিষিদ্ধকরণ-এর যৌক্তিকতা প্রমাণিত করেছেন। উত্তরাধিকার নীতির প্রচলন এবং জুয়া ও প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়ের অনিবার্যতা সুস্পষ্টরূপে অর্থোৎপাদন, সঞ্চয় ও ব্যয় করার পদ্ধতির উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে ব্যক্তিগত অধিকারের কতগুলো সীমানা নির্দেশ করেছেন। এই নিদর্শনসমূহ যথাযথরূপে বজায় রেখে এর অভ্যন্তরে থেকে যদি মানুষ নিজেদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সমাধা করে, তাহলে একদিকে যেমন মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা (Personal Liberty) সরক্ষিত থাকে, অন্যদিকে শ্রেণী সংগ্রাম (Class War) এবং এক শ্রেণীর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব জনিত যুলুম-নিপীড়নের মর্মান্তিক পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে না। যালেম পুঁজিবাদ অথবা মজুরদের ডিক্‌টেটরশিপ স্থাপিত হওয়ার কোন কারণ সৃষ্টি হতে পারে না।

মানুষের পারিবারিক জীবনের (Family Life) জন্যও আল্লাহ তায়ালা কতগুলো সীমা নির্ধারিত করেছেন। পর্দা, পরুষের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানের

অধিকার, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান এবং পিতা-মাতার অধিকার, কর্তব্য, তালাক ও খোলার নিয়ম, বহু বিবাহের শর্তাধীন অনুমতি, যেনা এবং অমূলক দোষারোপের قذف শাস্তি প্রভৃতি পারিবারিক জীবনের উল্লেখযোগ্য বিধান। এগুলোর সাহায্যে মানুষের পারিবারিক জীবনের চতুর্দিকে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। মানুষ যদি এ সীমার প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবন যাপন করে এবং এর মধ্যে থেকে পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে তাহলে যেমন কোন পরিবারই যুলুম-নিপীড়নের জাহান্নাম হতে পারে না, অনুরূপভাবে এসব ঘর হতে নারীদের শয়তানী স্বাধীনতার প্রলয়ংকারী তুফানেরও সৃষ্টি হতে পারে না। বর্তমান সময় এই সীমালংঘন করা হচ্ছে বলেই নারী স্বাধীনতার ভূ-কম্পন গোটা মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করার কুটিল কটাক্ষ প্রদর্শন করছে।

এরূপে সভ্যতা ও সামাজিক শৃংখলা সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তায়ালা 'কেসাসে'র আইন, চোরের জন্য হাত কাটার শাস্তি, মদ্যপান বিধি বহির্ভূত হওয়া, শরীরের বিশেষ অংগ আচ্ছাদিত করার বিধান–প্রভৃতি কতগুলো স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন। এগুলোর সাহায্যে মানব সমাজের ভাংগন, বিপর্যয় ও আভ্যন্তরীণ অশান্তির দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর নির্ধারিত সীমাগুলোর পূর্ণাংগ তালিকা পেশ করা এবং মানব জীবনের ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যাপারে এর প্রত্যেকটির কার্যকারিতা ও অনিবার্যতার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা এখানে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে উল্লেখিত রূপে একটি স্থায়ী, অটল ও অপরিবর্তনীয় সংবিধান (Constitution) রচনা করে দিয়েছেন। এটা মানুষের স্বাধীনতার মূল ভাবধারা এবং বুদ্ধি-বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতা মোটেই হরণ করে না। এটা মানুষের জীবন যাপনের জন্য একটি সরল, পরিচ্ছন্ন সুস্পষ্ট ও ঋজু রাজপথ রচনা করে দিয়েছে। এ পথ অবলম্বন করে চললে মানুষকে নিজেদের স্বাভাবিক অজ্ঞতা ও দুর্বলতার দরুন ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হতে হবে না, তার আভ্যন্তরীণ শক্তি, সামর্থ ও যোগ্যতা ভুল ও অন্যায় পথে প্রযুক্ত হয়ে ব্যর্থ হবে না। বস্তুত আল্লাহর নির্ধারিত এই একটানা পথে অগ্রসর হলেই মানুষের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণ ও প্রগতি লাভ করা সম্ভব। পর্বত শৃংগের চড়াই-উতরাই পথের একদিকে থাকে গভীর খাদ আর অপরদিকে উন্নত সমতল ভূমি। এ পথের শেষ প্রান্তকে নানাভাবে চিহ্নিত করা হয়। কেননা এ চিহ্ন না থাকলে পথিকের পক্ষে ভুল করার এবং নিমিষের সামান্য ভুলের ফলে অতল গহবরে নিপতিত হওয়ার পূর্ণ আশংকা রয়েছে।

কিন্তু এরূপ সীমা নির্ধারণের দ্বারা মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে বলে মনে করার কোনই কারণ আছে কি ? বস্তুত ধ্বংসের কবল হতে রক্ষা করা, পথের প্রত্যেক মোড় ও প্রত্যেক সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করাই এর উদ্দেশ্য। পথের প্রত্যেক বাঁকে এসেই তা পথের দিক নির্দেশ করে। বলে তোমার পথ এদিকে নয়, ওদিকে। এদিকে না দিয়ে ঐদিকেই তোমাকে যেতে হবে, এর ফলেই নিরাপদে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া পথিকের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সীমার উদ্দেশ্যও ঠিক তাই। চিহ্নসমূহই মানুষের জীবন পথের সঠিক দিক নির্দেশ করে। প্রত্যেক জটিল ও বন্ধুর স্থানে পথের প্রত্যেক বাঁকে এবং প্রত্যেক চৌমাথায় সীমা নির্দেশ করে মানুষকে শান্তি এবং কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে। কোন্ দিকে চলা উচিত, কোন দিকে নয়, তা সন্দেহাতীতরূপে বলে দেয়।

উপরে বলেছি, আল্লাহর নির্ধারিত সংবিধান অটল ও অপরিবর্তনীয়। তুরস্ক এবং ইরানের অধিবাসীদের ন্যায় এই সংবিধান সম্পূর্ণত বাতিল করা এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা মানুষের ইচ্ছাধীন ; কিন্তু একে পরিবর্তন করার, এতে সামান্য রদবদল করার অধিকার কারো নেই। অন্তিম কাল পর্যন্ত এটা অটল ও অপরিবর্তনীয় সংবিধান। যখনই এবং যেখানেই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে, এটাই হবে তার মূল গঠনতন্ত্র। কুরআন এবং সুন্নাতে রাসূল দুনিয়াতে যতদিন টিকে আছে, ততদিন এই গঠনতন্ত্রের একটি ধারাও স্থানচ্যুত বা পরিবর্তিত হতে পারে না। মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে আল্লাহর দেয়া এই সংবিধান অনুসরণ করে চলতে প্রত্যেকেই বাধ্য।

ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

ইসলামের এই শাসন সংবিধান অনুযায়ী যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ তায়ালা তার একটি উদ্দেশ্যও নির্ধারিত করে দিয়েছেন। কুরআন পাকের কয়েক স্থানেই এই উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ

النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ـ

—"আমি আমার নবীদেরকে সুস্পষ্ট বিধানসহ প্রেরণ করেছি। কিতাব এবং 'মিযান'ও তাদেরকে আমি দান করেছি। এর সাহায্যে মানুষ সুবিচার এবং ইনসাফ কায়েম করতে পারবে। আমি 'লৌহ'ও দিয়েছি। এতে বিরাট শক্তি এবং মানবের অশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (হাদীদ ঃ ২৫)

আয়াতে উল্লেখিত 'লৌহ' অর্থ রাষ্ট্রশক্তি বা (Coercive Power) এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত সুস্পষ্ট বিধান এবং তাঁর কিতাবে যে 'মীযান' দান করা হয়েছে—যে সঠিক ও ভারসাম্যযুক্ত (Well Balanced) জীবন ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে, সেই অনুসারে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সামাজিক সুবিচার (Social Justice) কায়েম করাই আম্বিয়ায়ে কিরামের একমাত্র কাজ। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط (الحج ـ ٤١)

–"এদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা এবং রাজশক্তি দান করি, তাহলে তারা সালাত 'কায়েম' করবে, যাকাত 'দিবে' ভাল ও কল্যাণকর কাজ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখবে।

(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪১)

অন্য আর এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ (ال عمران : ١١٠)

—"তোমরা সবচেয়ে উত্তম জাতি, নিখিল মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

এ আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের পরিকল্পিত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য 'নেতিবাচক' (Negative) নয়, মূলত এর সম্মুখে এক যথার্থ (Positive) উদ্দেশ্য বর্তমান রয়েছে। মানুষকে পরস্পরের যুলুম-নিপীড়ন হতে মুক্তি দেয়া তাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং দেশকে বহিরাক্রমণ হতে রক্ষা করাই এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সামাজিক সুবিচারের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাও এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধান নির্ধারিত পাপের সমস্ত উৎস ও উপায় বন্ধ করা এবং পুণ্য ও কল্যাণময় কাজের সকল পথ উন্মুক্ত করাই এর উদ্দেশ্য। এ জন্য স্থান এবং পরিস্থিতি বিশেষে রাষ্ট্র শক্তির প্রয়োগ করা চলবে।

প্রচার প্রপাগাণ্ডা করা হবে। সামাজিক শিক্ষা ও দীক্ষাদানের বহুবিধ উপায়ও অবলম্বিত হবে। সামাজিক প্রভাব এবং জনমতের চাপও এ জন্য প্রযুক্ত হবে।

সার্বাত্মক রাষ্ট্র

এ ধরনের রাষ্ট্র যে নিজের কর্মক্ষেত্র ও প্রভাব পরিসরকে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। মূলত এটা সর্বাত্মক রাষ্ট্রব্যবস্থা। সকল মানুষকে এবং মানুষের গোটা জীবনকে এটা নিজ প্রভাবাধীন করে নেয়। সমাজ ও সংস্কৃতির প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগকে এটা স্বীয় বিশিষ্ট নৈতিক দৃষ্টিভংগী এবং সংস্কারমূলক কর্মসূচী অনুসারে গঠন করে। এরূপ রাষ্ট্রের অধীন কোন মানুষ জীবনের কোন একটি ব্যাপারকেও 'ব্যক্তিগত' বলে ঘোষণা করতে পারে না। এই হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্র ফ্যাসিষ্ট অথবা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের প্রায় অনুরূপ। কিন্তু সর্বাত্মক হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান যুগের একনায়কত্বমূলক (Totalitarian) ও স্বৈরাচারী (Autharitarian) রাষ্ট্রসমূহের সাথে এর কোনই সামঞ্জস্য নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা কখনই হরণ করা যেতে পারে না। ডিকটেটরশীপেরও নামগন্ধ এতে নেই। এ ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রনীতিতে যে পরিপূর্ণ সুবিচার ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং 'হক' ও 'বাতিলের' মধ্যে যে সূক্ষ্ম সীমানা নির্ধারিত হয়েছে তা দেখে প্রত্যেকটি সত্যানুসন্ধিৎসু (সত্যের সন্ধানি) ব্যক্তির মন সাক্ষ্য দেবে যে, এরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা রচনা করা আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

দলীয় এবং আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র

ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান, এর উদ্দেশ্য এবং এর সংস্কারমূলক রূপ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে নিসন্দেহে জানা যায় যে, এ ধরনের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে যারা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করেছে, যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সংস্কারমূলক কার্যক্রমের কেবল সমর্থকই নয়—এর প্রতি কেবল পরিপূর্ণ বিশ্বাসই স্থাপন করেনি ; বরং অন্তর্নিহিত স্বতস্ফূর্ত ভাবধারা এবং এর দূরবর্তী খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও যারা সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ; বস্তুত তারাই ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করার উপযুক্ত। ইসলাম এ ব্যাপারে ভৌগলিক বর্ণ বা ভাষাগত কোন শর্ত আরোপ করেনি—নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মানুষের সম্মুখেই ইসলামের সংবিধান, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং সংস্কারমূলক কার্যসূচী

উপস্থিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তা হৃদয় মন দিয়ে গ্রহণ করবে—সে যে বংশের, যে দেশের এবং যে জাতিরই লোক হোক না কেন—তার রাষ্ট্র পরিচালক দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথে কোন বাধা থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা তা গ্রহণ করবে না, রাষ্ট্র পরিচালকদের কোন কাজেই তাকে শরীক করা যেতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সে 'যিম্মী' (Subject) হয়ে বাস করতে পারে। ইসলামী আইনে তার জন্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের জান-মালের ও ইয্যত-আব্রুর পূর্ণরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। এ ছাড়াও রাষ্ট্রীয় কর্ম পরিচালনের ব্যাপারে তাদেরকে কোনই অধিকার দেয়া হয়নি। কারণ এটা একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র। এর পরিচালনা ও নেতৃত্বের দায়িত্ব কেবল তারাই সঠিকরূপে সম্পন্ন করতে পারে যারা সেই আদর্শে বিশ্বাসী ও তার অনুসারী। এ দিক দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র ও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে এক প্রকার সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু বিরোধী মতাবলম্বীদের (অ-কমিউনিষ্টদের) প্রতি কমিউনিষ্ট পরিচালিত রাষ্ট্র যেরূপ আচরণ করে থাকে তার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের প্রতি প্রযোজ্য আচরণের বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নেই। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগে সংগেই এর নিজস্ব মতবাদ ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতিকে অ-কমিউনিষ্টদের উপর জবরদস্তিমূলক পন্থায় চাপিয়ে দেয়া হয়, তা স্বীকার না করলে জায়গা জমি কেড়ে নেয়া হয়, রক্তপাত ও খুন-জখমের প্রচণ্ডতায় ধরিত্রী প্রকম্পিত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষকে পৃথিবীর জাহান্নাম—সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ভিন্ন পন্থাবলম্বীদের সাথে এরূপ আচরণ কোন দিনই করে না। ইসলামী রাষ্ট্র অ-মুসলিমদের প্রতি উদার মনোভাব ও সুবিচারমূলক ব্যবহার প্রদর্শন করে থাকে। এ ব্যাপারে ইনসাফ ও যুলুম এবং সততা ও মিথ্যার যে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা দেখে প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ও সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি তার যথার্থতা এবং অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতা নিসন্দেহে স্বীকার করবে। প্রত্যেকটি লোক অনুধাবন করতে পারবে যে, মানুষকে কল্যাণ পথের সন্ধান দেয়ার জন্য আল্লাহর তরফ হতে যে সংস্কারক আবির্ভূত হন, তাঁর আদর্শ-কর্মনীতি এবং দুনিয়ার কৃত্রিম ও কপট সংস্কারকদের (?) কর্মপন্থার মধ্যে আসমান-যমীন পার্থক্য রয়েছে।

খেলাফত

অতপর আমি ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন পদ্ধতি ও কর্মনীতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করব। ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী সার্বভৌম প্রভুত্বের

অধিকারী ও আইন রচয়িতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা—একথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। বস্তুত এটাই হচ্ছে ইসলামী মতাদর্শের মূলনীতি। দুনিয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে যারা সচেষ্ট হবেন, এই মূলনীতির দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা নির্ধারণ করতে হবে। একটু চিন্তা করলেই নিসন্দেহে বুঝতে পারা যায় যে, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী মানুষ 'প্রকৃত সার্বভৌম প্রভু' আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধিত্বের মর্যাদাই লাভ করতে পারেন, অন্য কিছু নয়। ঠিক এ জন্যই ইসলামও তাঁকে এই খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা দান করেছে, কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص

—"তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও তদনুযায়ী সৎকর্মশীল লোকদের নিকট আল্লাহ এই ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে দুনিয়াতে 'খলীফা' বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন, তাদের পূর্ববর্তী লোকদের যেরূপ এই মর্যাদা দেয়া হয়েছিল।"(সূরা আন নূর ঃ ৫৫)

ইসলামের রাষ্ট্র-দর্শনের উপর এ আয়াতটি সুস্পষ্টরূপে আলোকপাত করছে। এতে দু'টি মূলতত্ত্বের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

প্রথমতঃ ইসলাম মানুষকে প্রভুত্বের (Rulership) পরিবর্তে খেলাফতে'র (Viceregency) অধিকার দান করেছে এবং অনুরূপ পরিভাষা ব্যবহার করেছে। কারণ ইসলামী আদর্শে প্রভুত্ব ও আইন রচনার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য সুরক্ষিত। অতএব ইসলামী গণতন্ত্র অনুযায়ী যারাই দুনিয়ায় শাসনকার্য চালাবেন, তাঁরা অনিবার্যরূপে উচ্চতর প্রভুর (আল্লাহর) প্রতিনিধিই (Viceregent) হবেন, তাঁরা মানুষের জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর প্রদত্ত অধিকার ও ইখতিয়ার (Delegate Powers) প্রয়োগ করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত খলীফা নিযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি সমগ্র মু'মিনদের প্রতিই দেয়া হয়েছে—ব্যক্তি বিশেষকে নয়। 'মু'মিনদের মধ্য হতে একজনকে খলীফা বানাবো'—উক্ত আয়াতে এরূপ বলা হয়নি। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, মূলত প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিই আল্লাহর প্রতিনিধি—খলীফা। আল্লাহর তরফ হতে মু'মিনদের যে 'খিলাফত' দান করা হয়েছে, তা সার্বজনীন খিলাফত (Popular Viceregency), কোন ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র, কিংবা শ্রেণী

বিশেষের জন্য এটা নির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত নয়। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহর 'খলীফা'। এ জন্য প্রত্যেক খলীফা ব্যক্তিগতভাবেও আল্লাহর নিকট দায়ী।

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

—"তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বসম্পন্ন এবং তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর নিকট নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"

আর খলীফা হওয়ার দিক দিয়ে মানুষের পরস্পরের মধ্যে তারতম্য, পার্থক্য, কোন প্রকার বড় ছোট বা উঁচু নীচু নেই।

ইসলামী গণতন্ত্রের স্বরূপ

ইসলামী রাজনীতিতে গণতন্ত্রের এটাই মূল ভিত্তি। সার্বজনীন খিলাফতের উল্লিখিত ধারণার বিশ্লেষণ করলে অনিবার্যরূপে নিম্নলিখিত ফল পরিলক্ষিত হবে।

এক ঃ ইসলামী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর 'খলীফা' হবে, খিলাফতের দায়িত্ব পালনে তারা সকলেই সমানভাবে শরীক হবে, এ জন্যই উক্ত সমাজে শ্রেণীবিভেদ, জন্মগত বা সামাজিক বৈষম্য ও পার্থক্যের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান মর্যাদা ও সমান সম্মানের অধিকারী। অবশ্য ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও স্বভাব-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে কারো বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হতে পারে। হযরত নবী করীম (সা) একথাই সুস্পষ্ট করে বলেছেন নিম্নলিখিত হাদীসে ঃ

لَيْسَ لأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى اَحَدٍ اِلاَّ بِدِيْنٍ وَتَقْوٰى - اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْا اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ - لاَ فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلٰى عَجَمِىٍّ وَلاَ لِعَجَمِىٍّ عَلٰى عَرَبِىٍّ وَلاَ لاَبْيَضُ عَلٰى اَسْوَدَ وَلاَ لاَسْوَدَ عَلٰى اَبْيَضَ اِلاَّ بِالتَّقْوٰى -

—"কারো উপর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। তা প্রতিপন্ন হতে পারে একমাত্র দ্বীন ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান, কর্ম ও তাকওয়ার কম বেশীর কারণে। সব মানুষই আদমের সন্তান ; আর আদম মাটি হতে সৃষ্ট। আরববাসীর অনারবের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আনারবদেরও কোন

শ্রেষ্ঠত্ব নেই আরববাসীদের উপর তদনুরূপ শ্বেতাংগের কৃষ্ণাংগের উপর এবং কৃষ্ণাংগেরও শ্বেতাংগের উপর কোনই শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই।.....কারো শ্রেষ্টত্ব স্বীকার হতে পারে একমাত্র তাক্ওয়ার কারণে।"

মক্কা বিজয়ের ফলে সমগ্র আরব দেশ ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলে পর বিশ্বনবী (সা) তাঁর বংশ বা গোত্রের লোকদের—তদানীন্তন আরব দেশের ব্রাহ্মণদের সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا الْاَبَاءِ ـ اَيُّهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ ـ لاَ فَخْرَ لِلاَنْسَابِ ـ لاَفَضْلَ لِلْعَرَبِيِّ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَلاَ لِلْعَجَمِيِّ عَلَى الْعَرَبِيِّ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ـ

—"হে কুরাইশগণ ! আল্লাহ তোমাদের আঁধার যুগের গৌরব, অহংকার এবং বংশীয় আভিজাত্য দূর করে দিয়েছেন। হে মানুষ ! তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। আর আদম মাটি হতে তৈরী। বংশীয় গৌরবের কোন অবকাশ নেই। অনারবদের উপর আরবদের এবং আরবদের উপর অনারবদের কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী 'মুত্তাকী' ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত।"

দুই ঃ ইসলামী সমাজে কোন ব্যক্তি বা দলের জন্মগত সামাজিক মর্যাদা (Social Status) কিংবা পরিগৃহীত পেশার দিক দিয়ে কারো জন্য কোন প্রতিবন্ধকতার (Disabilities) সৃষ্টি করা যাবে না এবং কারো ব্যক্তিগত যোগ্যতা প্রতিভার স্ফুরণ এবং ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ সাধনের পথে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করা যেতে পারে না। সমাজের অন্যান্য সকলের ন্যায় উন্নতি লাভের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রত্যেক মানুষই সমানভাবে লাভ করতে পারবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাভাবিক শক্তি, যোগ্যতা ও প্রতিভার বলে উন্নতি লাভ করতে পারবে—যতখানি উন্নতি লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব। উন্নতি লাভের সকল দুয়ারই সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে। কেউ কারো অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারবে না। ইসলামী আদর্শে এই অবাধ সুযোগ লাভের ব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে বর্তমান রয়েছে। ইসলামী সমাজে দাস ও দাস পুত্রকেও সামরিক অফিসার এবং প্রাদেশিক গবর্ণর পর্যন্ত

নিযুক্ত করা হয়েছে। আর বড় বড় অভিজাত বংশের নেতৃস্থানীয় লোকগণ তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন, তাদের আনুগত্য স্বীকার করেছেন। চামড়ার জুতা সেলাই করতে করতে উঠে নেতৃত্বের উচ্চতম আসনে আসীন হলো—ইসলামের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা মোটেই বিরল নয়। অসংখ্য তাঁতী ও বস্ত্র ব্যবসায়ী দেশের কাযী, মুফতী ও ফেকাহ্ শাস্ত্রের 'ব্যাখ্যা' (ফকীহ) হওয়ার সুযোগ লাভ করেছেন। আজ তাঁরা ইসলামের ইতিহাসে মহান ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হচ্ছেন।

হযরত নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন ঃ

اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِىٌ -

—"কোন হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের 'নেতা' নিযুক্ত করা হয়, তবে তারও আদেশ পালন কর ও আনুগত্য স্বীকার কর।"

তিন ঃ ইসলামী আদর্শে গঠিত সমাজে কোন ব্যক্তি বা দলের (Group) পক্ষে ডিক্‌টেটর হয়ে বসার বিন্দুমাত্র সুযোগ থাকতে পারে না। এ সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহর খলীফা। জনগণের খেলাফত অধিকারকে হরণ করে নিরংকুশ প্রভু ও হর্তাকর্তা হয়ে বসা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সামাজিক শাসন ও শৃংখলা স্থাপনের জন্যই ইসলামী সমাজের প্রত্যেক নাগরিক ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী প্রত্যেক খলীফা—নিজ নিজ খেলাফত অধিকার যখন ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত (Concentrated) করে, তখন সে-ই হয় ইসলামী সমাজের 'শাসনকর্তা'।

অতএব একদিকে সে আল্লাহর নিকট দায়ী হয়, অন্যদিকে হয় জনগণের নিকট। কারণ, তারাই নিজ নিজ খেলাফত অধিকার এর হাতে অর্পণ করেছে বলেই তার পক্ষে 'শাসক' হওয়া সম্ভব হয়েছে এমতাবস্থায় সে (নির্বাচিত) খলীফা না হয়ে পরস্বাপহরণকারীর ভূমিকাই গ্রহণ করে। কারণ, ডিক্‌টেটর পদে সার্বজনীন খেলাফত সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল হয়ে যায়। ইসলামী রাষ্ট্র যে একটি সর্বাত্মক রাষ্ট্র তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ইসলামী জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগই এর প্রভাবাধীন হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের নায়কগণ যে আইন জারী করে, বস্তুত তাই হচ্ছে সর্বাত্মক–সর্ব ব্যাপক। আর ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বাত্মক হওয়ার এটাই মূল ভিত্তি। আল্লাহ মানব জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগের জন্য যে ব্যবস্থা দান করেছেন, তা অনিবার্যরূপে পরিপূর্ণ ব্যাপকতার সাথেই কার্যকরী হবে। আল্লাহ প্রদত্ত এই বিধান পরিত্যাগ করে

ইসলামী রাষ্ট্রনায়কগণ নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে নিয়ম-শৃংখলাবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা (Regimentation) প্রণয়নের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তারা বিশেষ কোন কাজ বা জীবিকা গ্রহণের জন্য, বিশেষ কোন জীবিকা হতে বিরত থাকার জন্য বিশেষ কোন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার জন্য, বিশেষ কোন শিক্ষা লাভ না করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের বাধ্য করতে পারে না। রুশ, জার্মানী এবং ইটালীর ডিক্টেটরগণ নিজেদের আমলে যেসব কর্তৃত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেছে কিংবা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে, ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরকে (রাষ্ট্রপতি) অনুরূপ অধিকার ও কর্তৃত্ব দেয়নি। এ ছাড়া লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইসলামী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর নিকট দায়ী। এই ব্যক্তিগত দায়িত্ব (Personal Responsibility) পালনের কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এ ব্যাপারে কেউ কারো অংশীদার নয়। এ জন্য আইনের সীমার মধ্যে স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক নাগরিক যেন নিজ ইচ্ছামত কোন পথ গ্রহণ করতে পারে এবং নিজের প্রবণতা অনুসারে উন্নতি লাভ করার জন্য নিজ শক্তি প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। আমীর (রাষ্ট্রপতি) কারো জীবন পথে কোন দিক দিয়েই বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতা বা নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করলে সে যালেম নামে অভিহিত হবে এবং এরূপ যুলুমের জন্য তাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। ঠিক এ জন্যই হযরত নবী করীম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের এ ধরনের কোন নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না।

চার ঃ ইসলামী সমাজের নারী-পুরুষ—প্রত্যেক বয়স্ক ও সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানই 'ভোট' দেয়ার অধিকার পাবে। কারণ, এরা প্রত্যেকেই আল্লাহ প্রদত্ত খেলাফতের অধিকারী। এই খেলাফতের প্রয়োগের ব্যাপারে, আল্লাহ তায়ালা বিদ্যা শিক্ষা বা ধন-সম্পত্তির কোন নির্দিষ্ট মানের শর্ত আরোপ করেননি। ঈমান এবং তদনুযায়ী সৎকর্মশীলতাই ভোটাধিকারের মাপকাঠি, অতএব ভোটদানের ব্যাপারে সকল মুসলমান সমান মর্যাদার অধিকারী।

ব্যক্তিতন্ত্র ও সমষ্টিতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন

ইসলাম একদিকে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, অন্যদিকে যে ব্যক্তিতন্ত্র (Individualism) সমাজ জীবনের প্রতিবন্ধক তারও মূলোচ্ছেদ করেছে। ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক অতি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে স্থাপিত করা হয়েছে। এতে কমিউনিজম ও ফ্যাসীবাদের ন্যায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র সমাজ

গর্ভে বিলীন করে দেয়া হয়নি ; পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের বল্গাহারা গণতন্ত্রের ন্যায় ব্যক্তিকে তার সীমালংঘন করে সমাজ স্বার্থে আঘাত হানারও অবকাশ দেয়া হয়নি। বস্তুত ইসলামের সমষ্টিগত জীবনের উদ্দেশ্য যা—তাই হচ্ছে ব্যক্তি জীবনের লক্ষ্য। আর তা হতে আল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। উপরন্তু ইসলামে ব্যক্তির অধিকারসমূহ যথাযথভাবে সুরক্ষিত করার পর সমষ্টির জন্য বিশেষ কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে ব্যষ্টিবাদ ও সমষ্টিবাদের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে। এতে ব্যক্তি তার প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উৎকর্য সাধনের পূর্ণ সুযোগ লাভ করতে পারে এবং সেই সংগে নিজের উৎকর্ষলব্ধ শক্তিসমূহের দ্বারা সমষ্টিরও বৃহত্তর কল্যাণ ও মংগল সাধনের ব্যাপারে সাহায্যকারী হতে পারে।

মূলত বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ ; কিন্তু এখানে তার অবকাশ নেই। ইসলামী গণতন্ত্রের পূর্বোক্তি বিশ্লেষণ হতে পাঠকদের মনে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে, তার পথ বন্ধ করাই এ সংক্ষিপ্ত ও প্রাসংগিক আলোচনার একমাত্র কারণ।

ইসলামী রাষ্ট্রের সংগঠন

সার্বজনীন খিলাফতের যে ব্যাখ্যা আমি করেছি, তদৃষ্টে ইসলামী রাষ্ট্রের ইমাম বা রাষ্ট্রপতির মর্যাদা কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ প্রদত্ত যে খিলাফত লাভ করেছে, এর প্রয়োগ ক্ষমতা সে নিজ সমাজ হতে এক উত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে স্বেচ্ছায় তার নিকট আমানত রাখে মাত্র। বস্তুত ইসলামী সমাজে খলীফার এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন মর্যাদা বা অধিকার নেই। তাঁকে যে 'খলীফা' নামে অভিহিত করা হয় তার অর্থ এই নয় যে, তিনি একাই আল্লাহর খলীফা। বরং সর্বসাধারণ মুসলমানের স্বতন্ত্র খিলাফত তাতে সমন্বিত ও কেন্দ্রীভূত হয়েছে বলেই তাকে 'খলীফা' বলা হয় মাত্র।

উপসংহারে ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। আশা করি এ আলোচনার ফলে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে পাঠকদের মনে সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হবে।

এক ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ ـ

"তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্মানার্হ (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)—এ মূলনীতি অনুযায়ী। অন্য কথায়, যারা নৈতিক চরিত্র ইত্যাদির উপর মুসলিম জনগণের পূর্ণ আস্থা থাকবে, 'রাষ্ট্রপতি' পদের জন্য কেবল তাঁকেই নির্বাচিত করা হবে এবং নির্বাচিত হওয়ার পর ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও অধিকার তাঁরই হবে। তাঁর উপর নিসংকোচে আস্থা স্থাপন করতে হবে, ভরসা করতে হবে।

তিনি যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষা অনুসরণ করে চলবেন, ততদিন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা প্রত্যেকটি নাগরিকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

দুই ঃ 'আমীর' (রাষ্ট্রপতি) সমালোচনার উর্ধে নয়। প্রত্যেক মুসলমানই তাঁর সমালোচনা করতে পারবে। কেবল তাঁর সামাজিক কাজকর্ম সম্বন্ধেই সমালোচনা করা যাবে তা নয় ; তাঁর ব্যক্তিগত (Private) জীবন সম্পর্কেও সমালোচনা করার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। (প্রয়োজন হলে) আমীরকে পদচ্যুতও করা যাবে। আইনের চোখে তার মর্যাদা সাধারণ নাগরিকদের সমান হবে, তার বিরুদ্ধে আদালতে মকদ্দমা দায়ের করা যেতে পারে এবং আদালতে তিনি কোন বৈষম্যমূলক মর্যাদা পাবার অধিকারী হবেন না।

তিন ঃ আমীর পরামর্শ করে কাজ করতে বাধ্য থাকবেন। সে জন্য একটি 'মজলিশে শুরা' বা পার্লামেন্ট গঠন করতে হবে। 'মজলিশে শুরার' প্রতি জনগণের অবিচল আস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ জন্য শুরার সদস্যগণকে মুসলিম নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়, যদিও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে জনগণের ভোটে শুরার সদস্য নির্বাচনের কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না।

চার ঃ শুরার ফায়সালা সাধারণত সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতেই হবে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম সংখ্যাধিক্যকে সত্যের মাপকাঠি বলে স্বীকার করে না।

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ج

—"পংকিল-কদর্য ও পবিত্র—এ দু'টি জিনিস কখনো সমান হতে পারে না—পংকিলের সংখ্যাধিক্য তোমাকে স্তম্ভিত করে দিলেও নয়।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ১০০) এক ব্যক্তির রায় গোটা 'মজলিশে শুরার' মিলিত মতের

বিপরীত হওয়ায়ও তা সত্য এবং সঠিক হতে পারে, ইসলামে তার পূর্ণ অবকাশ রয়েছে। অতএব এক ব্যক্তির রায় যদি সত্য হয়, তবে একটি বিরাট দল তার সমর্থক নয় বলেই তার রায় বর্জিত হবে ইসলাম একথা কিছুতেই স্বীকার করে না। অতএব আমীর মজলিশের সংখ্যাধিক্যের—না সংখ্যালঘুর রায় সমর্থন করবেন, তা পুরাপুরি তাঁরই ইচ্ছাধীন। এমন কি ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর গোটা মজলিশের মিলিত রায় অস্বীকার করে নিজের মতের ভিত্তিতে কোন ফায়সালা গ্রহণ করার পূর্ণ অধিকারী হবেন। কিন্তু এসব ব্যাপারেই আমীর তাঁর বিশাল ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে কিভাবে প্রয়োগ করছেন—তাকওয়া ও আল্লাহভীতি সহকারে, না খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্তী হয়ে—রাষ্ট্রের জনসাধারণ তা সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করবে। শেষোক্ত অবস্থা পরিলক্ষিত হলে জনগণের অভিমতক্রমে এমন আমীরের পদচ্যুত হওয়ার পথে কোনই বাধা থাকতে পারে না।

পাঁচ ঃ 'এমারত' (রাষ্ট্রপতিত্ব) কিংবা 'মজলিশে শুরার' সদস্য পদ অথবা অন্য কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে এমন ব্যক্তিকে নির্বাচিত বা নিযুক্ত করা যেতে পারে না, যে ব্যক্তি এর প্রার্থী কিংবা তা লাভ করার জন্য কোন না কোন প্রকার চেষ্টা করবে। ইসলামে পদপ্রার্থী হওয়ার প্রথা (Candidature) মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। এমন কি নিজের জন্য নির্বাচন প্রোপাগান্ডার অভিযান চালাবারও কোন অবকাশ ইসলামী হুকুমাতে নেই। 'প্রার্থীকে কোন পদ দেয়া হবে না'—নবী করীম (সা)-এর এটা সুস্পষ্ট নির্দেশ। একটি নির্দিষ্ট পদের জন্য একাধিক ব্যক্তি প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবে, একে অন্যের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করবে, পোষ্টার হ্যান্ডবিল সভা-সম্মেলন এবং সংবাদপত্র ও যাবতীয় প্রচারণার হাতিয়ার ব্যবহার করে সাধারণ ভোটারকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করবে, মিঠাই শিরণী পোলাও-কোর্মা বিতরণ করা হবে, মোটরে চড়ে ভোটদাতাদের বাড়ী বাড়ী ছুটোছুটি করবে—এসব কদর্য কার্যক্রম ইসলাম কখনই বরদাশত করতে পারে না। কারণ, এর ফলে কেবল তারাই নির্বাচিত হয়ে থাকে, যারা মিথ্যা, ধোঁকা-প্রতারণা ও অর্থের বন্যা প্রবাহের প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারে। মূলত এ কার্যক্রম শয়তানী গণতন্ত্রের অভিশপ্ত পদ্ধতি। ইসলামী হুকুমাতে এর শতাংশের একাংশও অনুষ্ঠিত হলে খলীফা বা 'মজলিশে শুরার' সদস্য হিসেবে এসব লোকের নির্বাচিত হওয়া তো দূরের কথা আদালতে এদেরকে অভিযুক্ত করা হবে।

ছয় ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের 'মজলিশে শুরার' পার্টি প্রথার অবকাশ নেই। শুরার অভ্যন্তরে প্রত্যেক সদস্যই স্বতন্ত্রভাবে থাকবে এবং সত্যের স্বপক্ষে ভোট দেবে—অভিমত প্রকাশ করবে। কোন সদস্য সকল সময় এবং সকল অবস্থায়

নির্দিষ্ট কোন দলের সমর্থন করবে—তারা ন্যায় করুক, কি অন্যায় করুক, তার কোন বিচার করবে না—ইসলামী হুকুমাতে এরূপ কার্যকলাপের অবকাশ নেই। বস্তুত ইসলামী আদর্শ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা সত্যের অনুসারী বলে বিবেচিত হবে, তাকেই সমর্থন করতে হবে। ফলে আজ যাকে সত্যাশ্রয়ী মনে হবে, তার সমর্থন করা হবে, আগামীকাল তাকেই অন্য কোন ব্যাপারে সত্যের বিরোধী মনে হলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। এটাই হচ্ছে ইসলামী আদর্শের কর্মনীতি ও ভাবধারা।

সাত ঃ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের প্রভাব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহর আইনকে তাঁর বান্দাহদের উপর জারী করাই হচ্ছে বিচারকের কাজ। তিনি আদালতের আসনে আমীর বা খলীফার প্রতিনিধি হয়ে বসবেন না, বস্তুত তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবেই তথায় আসীন হবেন। অতএব আদালতের সীমার মধ্যে স্বয়ং খলীফার (রাষ্ট্রপ্রধান) পদমর্যাদারও কোন গুরুত্ব থাকবে না। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন কোন ব্যক্তিই স্বীয় ব্যক্তিগত, বংশীয় বা সরকারী পদমর্যাদার দরুন বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া হতে অব্যাহতি পেতে পারে না। মজুর, কৃষক, দরিদ্র প্রভৃতি সাধারণ নাগরিক রাষ্ট্রের যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে মকদ্দমা দায়ের করতে পারে। এমন কি স্বয়ং খলীফার বিরুদ্ধেও এ মোকদ্দমা পেশ হতে পারে এবং ফরিয়াদীর স্বত্ব প্রমাণিত হলে আল্লাহর আইন খলীফার প্রতি প্রযোজ্য হবে। বিচারক এ কাজ সাধারণ নাগরিকের উপর যেমন আল্লাহর আইন জারী করে থাকেন, অনুরূপভাবে খলীফার উপরও তা জারী করার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

অনুরূপ স্বয়ং খলীফারও কারো বিরুদ্ধে নিজের কোন অভিযোগ থাকলে তিনি স্বয়ং শাসনকর্তা সুলভ ক্ষমতার বলে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন না। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তিনিও একজন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় আদালতের দুয়ারে উপস্থিত হতে বাধ্য হবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তারিত ও পূর্ণাংগ চিত্র পেশ করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভব নয়। ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত ভাবধারা এবং এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য হযরত নবী করীম (সা)-এর জীবনী এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের ইতিহাস পেশ করা আবশ্যক। কিন্তু এই প্রবন্ধে তার অবকাশ নেই। তবুও এখানে যতটুকু বলা হয়েছে তা হতে ইসলামী হুকুমাত সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।